পুতুলের চিঠি

সুবোধ ঘোষ

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শিল্পী : সমর দে

দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৭১

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় রায়, মুদ্রণশ্রী প্রেস,
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

অশোকের শিলালিপি কাঁদলো ... ১
আকাশ থেকে মিষ্টি ঝরে পড়লো ! ... ১৩
বলাসুরের হাড় খুঁজে পেলাম ... ২৫
বিলি বাঘিনীরদুঃখের কারণ কি ? ... ৪৩
একদিন লাটসাহেব হয়েছিলাম ! ... ৫৭
বৃষকেতু ক্যাসাবিয়াংকা আর আমাদের গবু ... ৭১
খরগোসের ভয়ে বাঘ পালায় কেন ? ... ৮৫
দানবী মানবী দেবী ... ৯৯

দুঃখের চিঠি
ঝা কেন কে
কি কেন
কেন
কি
কেন!

ঘুম ভেঙ্গে দেখি, পয়লা বৈশাখের সূর্য্য নারকেল গাছের পাতার ঝালর সরিয়ে ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে একটা ভোরের ট্রেন খুব আস্তে এগিয়ে চলেছে। তারপর থেমে গেল, ইঞ্জিনটা খুব জোরে একবার হাঁসফাঁস করে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একেবারে চুপ করে গেল।

এখন শুধু শুনতে পাই সেই পাখীর ডাক। কাঁকুলিয়ার নতুন বছরের প্রভাতে সবচেয়ে আগে জেগেছে পাখীর দল। কি মিষ্টি গলা পাখীগুলির। মনে হয় ওরা শুধু মিছরি খায়। যেন গান গেয়ে গেয়ে অন্ধকার তাড়ায় ওরা। ফুলে ফুলে এত মধু ভরে উঠে কেন? ওরা ডেকে ডেকে বাতাস মিষ্টি করে দেয় তাই তো!

নইলে, পৃথিবীতে শুধু থাকতো রাত্রি — রাত্রি রাত্রি অফুরাণ রাত্রি! অন্ধকার আর পেঁচার ডাক, ভোর হত না, আলো ফুটতো না। আর কী হতো? সারা রাত্রি পেঁচার ডাকে যত তিতকুটো কষা ফলের গাছে ফুল ফুটতো। অন্ধ মৌমাছির দল সেই তিতকুটো ফুলের রস লুটে নিয়ে যেত। মৌচাকও হতো নিশ্চয়, কিন্তু সে মৌচাক থেকে আমরা যে-জিনিষ পেতাম, তার নাম মধু নয় তার নাম তিতু।

তাই ভাবছিলাম, ভাগ্যিস নববর্ষ আসে, সূর্য্য ওঠে, পাখি ডাকে। পাখির ডাক মিষ্টি — তাই ফল মিষ্টি, তাই মৌচাক মিষ্টি। ওঁ মধু মধু মধু।

আজও নতুন বছরের প্রথম সকালে উঠে পাখীর ডাক শুনছি। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যেদিন প্রাণের গায়ে শুধু স্পন্দন নয়, শব্দের সাড়া জাগলো — তারই প্রথম সুরের গৌরব যেন পাখীর ডাকে বেঁচে রয়েছে। পশ্চিমের বাগানটার দিকে একবার তাকাই। সেখানে

এখনো একটু ফিকে অন্ধকারের ছোঁয়া যেন রয়ে গেছে। গাছগুলির ঘুমঘোর বোধহয় এখনো ভাঙেনি। পাখীগুলিকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তাদের গানের শব্দ শুনছি। কতগুলি অদেখা নুপূর যেন গাছের মাথায়, পাতার আড়ালে, মাঠের ঘাসে লুটোপুটি করছে।

একটু বিমনা হয়ে যাই। হঠাৎ কেমন জানি একটু ভয় হয় — এই রূপ-কথার আবেশ এখুনি মুছে যাবে।

তাই হলো। আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর। নতুন বছরের সূর্য্যের লাল আলো কালো হয়ে এল! এই পাখির ডাকের সুর যেন কতগুলি কিচির মিচির শব্দ। এমন সুন্দর একটা সকাল বেলার সব আনন্দ মাটী করে দেবার জন্য কে যেন এসে শত্রুর মত দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে! বড় কর্কশ আর বীভৎস তার গলার স্বর।

ওপরের সূর্য্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, এইবার নীচের দিকে তাকালাম।

দেখলাম। আমার শত্রুটী দেখতে খুব ছোট্ট। ন্যাংটো রোগা রুক্ষ রুগ্ন। তার হাতে একটা টিনের মগ। কান্নার সুরে কঁকিয়ে কঁকিয়ে ভিক্ষে চাইছিল ছেলেটা। পয়সা চায় না, পোষাক চায় না, মিষ্টি সন্দেশ-টন্দেশ কিছু চায় না সে। দুটী ভাত দাও, কিম্বা ভাতের ফেন। খাই খাই খাই — শুধু খেতে চায়। কোন বড়লোকের বমি পেলেও চেটেপুটে খেয়ে ফেলবে।

জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। নতুন বছরের সূর্য্য-ওঠা দেখার আনন্দটুকু আর ভোগ করতে দিল না। তবু কি বিদেয় হবে শীগ্‌গিরি? ঠায় বসে থাকবে, চেঁচাবে কাঁদবে। পরম পুণ্যদিনের প্রথম মুহূর্ত্তটাকে বিষিয়ে দিয়ে, আরো কত প্রতিশোধ নেবার জন্য কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে!

নাঃ, সব নষ্ট করে দিল। এখন কান পাতলে শুধু ওরই কান্না

শুনতে হবে, উঁকি দিলে শুধু ওরই মূর্ত্তি চোখে পড়বে। সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ওঁ তিতু তিতু তিতু।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ জানি না। পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল। প্রথমেই চোখে পড়লো, পোষ্টকার্ডের চিঠি, মোটা মোটা আস্ত আস্ত অক্ষরে লেখা। পড়লাম চিঠি ঃ

"হাজারিবাগ। সংক্রান্তি। শ্রীচরণেষু। মেজকাকু। কতদিন হয় তুমি কলকাতায় চলে গেছ। আমরা আর গল্প শুনতে পাই না। এবার থেকে চিঠিতে গল্প লিখে পাঠাবে। মিথ্যে গল্প লিখবে না। সত্যি গল্প লিখবে। তোমার নিজের গল্প। প্রণাম। ইতি পুতুল।

পুনশ্চ। দুঃখের গল্প হলে মিথ্যে করে লিখবে।"

পুতুলের চিঠির উত্তর দিতে হবে! তখুনি কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, সেই ভিখারী ছেলেটা আছে না গেছে। কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। যদি সত্যি এখনো বসে থাকে, যদি আবার কেঁদে কেঁদে ভাতের জন্য বায়না ধরে, তবে কি উপায় হবে?

তাহলে চিল-কোঠায় গিয়ে বসবো। একটি মাত্র জানালা আছে সেই ঘরে। সেটাও বন্ধ করে দেব। ভিখিরী ছেলেটার গলার স্বর আর কানে পৌঁছবে না। বেশ আরামসে চিঠি লিখবো।

জানালাটা খুলে একবার ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ছেলেটা রয়েছে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। মসৃণ সিমেন্টের সিঁড়িতে গুটিসুটি হয়ে, একটা হাতের ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা, টিনের মগটা একটু দূরে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা কাক চোরের মত চুপি চুপি এসে ঠুক ঠুক করে মগটাকে ঠুকরোচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধূর্ত্ত কাকগুলো মগটাকে অনেকদূর হেঁচড়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় একেবারে গাব করে দিতে চায়।

আবার টেবিলের কাছে এসে বসলাম। পুতুলের চিঠির উত্তর দিতে হবে। লিখতে হবে, কলম তুলে ধরছি, কাগজ ভাঁজ করছি,

এক লাইন লিখে তিনবার করে কাটছি, মিছিমিছি ব্লটিং পেপার চাপছি বার বার। মনে আসছে কত কথা, লেখার কিছু আসছে না।

শুধু মনে পড়ছে দুর্ভিক্ষের কথা, যুদ্ধের কথা। বৃথা মনের ভেতর কতগুলি টর্পেডো ফাট্‌ছে, আর বড় বড় জাহাজ ডুবছে। তার মধ্যে পুতুলের পড়ার মত গল্প আর খুঁজে পাচ্ছি না।

নীচে নেমে যেতে হলো। চোর কাকগুলোকে তাড়িয়ে ভিখিরী ছেলের টিনের মগটা বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলাম। মগের ভেতর কিছু খাবার ভরে দিয়ে আবার ওর মাথার কাছে রেখে দিলাম, ঘুম ভাঙালাম না।

ঘুমিয়ে থাকুক্। পয়লা বৈশাখের ভোরের আলোতে দুঃখী মানুষের প্রাণ ঘুমিয়ে থাক। কোন্ এক দূর পাড়াগাঁর একটা কচি মানুষের প্রাণ পথহারা হয়েছে। বৈশাখী ভোরের স্বপ্ন ওকে এখন দু'হাত ধ'রে কোন এক গাঁয়ের আমবাগানের ছায়ার আর অপরাজিতার ঝোঁপে ঝোঁপে লুকোচুরি খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘুমাক্, ঘুমাক্। হাঁ, এইবার চিঠিটা লিখে ফেলি।

পয়লা বৈশাখ। কাঁকুলিয়া। স্নেহের পুতুল।

একটা গল্প লিখে পাঠাচ্ছি। মিথ্যে না সত্য, তা বলবো না। আরো গল্প পাঠাবো। আমার কাছে যেমন অনেক দুঃখের গল্প আছে, তেমনি সুখের গল্পও আছে, ছেলেবেলার গল্প আছে, বুড়োবেলার গল্পও আছে। আজ ভোরবেলাতেই তোমারই মত ছোট্ট চেহারার একটা গল্প আমাদের বাসার দরজায় এসে বসেছিল। সে কিন্তু বড় দুঃখের গল্প। বাংলা দেশে এখন দুর্ভিক্ষ। এই ছেলেটির বাড়ী হয়তো কোন দূর পাড়া গাঁয়ে। খেতে না পেয়ে সহরে এসেছে। দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে চাইছে। ছিল চাষার ছেলে, নিজের ঘরের আঙিনায় একদিন হেসেখেলে লাফিয়ে দিন কাটিয়েছে। কুঁড়ে ঘরের ভেতরেও

একদিন বাপ মায়ের বুক ঘেঁসে আরামে ঘুমিয়েছে এই ছেলেটা, আজ ওর ঘর নেই। বাপ-মা কোথায় গেছে ঠিক নেই। ওর জীবনে আর কোন খেলা নেই। আজ সে ভিখিরী হয়ে গেছে।

আর একটী ভিখিরী ছেলের গল্প বলি। আর একটু বড় হয়ে তুমি যখন আরও অনেক বই পড়বে, তখন মহাপুরুষের কত বিচিত্র জীবন ও জন্মকাহিনী জানতে পারবে! গৌতম বুদ্ধ যেদিন জন্মালেন, তার আগের দিন রাত্রে বুদ্ধ মাতা মায়া দেবী স্বপ্নে একটী সুন্দর হাতীর মূর্তি দেখেছিলেন। সেই হাতীর শরীরটা যেন আলো দিয়ে গড়া। যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবার আগে যেরুজালেমের পথিকেরা সন্ধ্যার আকাশে একটি নতুন নক্ষত্র দেখতে পেয়েছিল। সব মহাপুরুষের জন্মকাহিনীর মধ্যে এইরকম নানা অসাধারণ ঘটনার কথা আছে। পুরাণের দেবতাদের জন্মকাহিনী তো আরও বিচিত্র। কোন দেবশিশু বা মহামানব জন্ম নেবার সময় নাকি আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতো, হঠাৎ নতুন রকমের একটা সুগন্ধে বাতাস ভরে উঠতো, বীণা বেজে উঠতো চারদিকে।

অনেকদিন আগের কথা। পরীক্ষাটা কোন মতে সেরে দিয়ে হাজারিবাগ থেকে আমি চলে গিয়েছিলাম। জানতাম পাশ করতে পারবো না। তখন আমি ট্রেণে চড়ে বেড়াতে ভালবাসতাম না। হেঁটে হেঁটে দেশ ঘুরে দেখতেই ভাল লাগতো। ভাগ্যিস্, এত হেঁটে ঘুরেছিলাম, পুতুল। তাই না এত গল্প পথ থেকে কুড়িয়ে আনতে পেরেছি।

সেদিন হেঁটে হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সারাদিন হেঁটেছি, সারাপথ শুধু ময়ূরের ঝাঁক দেখতে দেখতে আর একটা উদার বেড়া-শূন্য বাগানের পেয়ারা খেতে খেতে চলেছি। বিশ্বাস ছিল, ঠিক সন্ধ্যা হতে হতেই সাসারাম পৌঁছে যাব।

কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাসারাম আরও কতদূর আছে জানি

না। নিকটে কোন গ্রাম দেখছি না। পথের দুপাশে শুধু সীমাহীন অন্ধকারের মাঠ পড়ে রয়েছে। কাছে বা দূরে কোন গেরস্থালীর একটি ছোট দীপের আলোও দেখতে পাই না।

বিমর্ষভাবে পথের উপর চুপ করে দাঁড়ালাম। শুধু খুঁজছিলাম আজকের রাত্রিটার মত একটু পরিচ্ছন্ন জায়গা। কাঁটা ধূলো পোকা মাকড় নেই, এইরকম একটু জায়গা পেলেই ধন্য হয়ে যাই। ক্লান্ত শরীরটাকে রাত্রিটার মত একা ঘুমের কবরে পুঁতে দিয়ে আবার ভোরে জেগে উঠবো।

চোখের সামনেই কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। গাছ নয়, মানুষ নয়। তবে কি ? ভাল করে তাকিয়ে রইলাম।

ভয় ভেঙে গেল। ওটা একটা কাঠের খুঁটি। খুঁটির মাথায় একটা সাইন বোর্ড। অনুমানে বুঝে নিলাম, এটা একটা রাস্তার নিশানা। ঠিক তাই, খুঁটির বাঁ পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে নিশ্চয় কোন লোকালয়ের দিকে। হয়তো কোন বস্তি বা বাজার বা কোন থানা।

এই কাঁচা রাস্তা কতদূর গেছে জানি না, তবু কপাল ঠুকে পথ ধরলাম আবার। কিন্তু পথে নেমেই আবার একটা আশঙ্কা জাগলো মনে। পথে ধূলো নেই। ঘাসে ছেয়ে আছে রাস্তাটা। গরুর গাড়ীর চাকার কোন ক্ষত চিহ্ন নাই। বেশ ভরাট আর নরম রাস্তা। তবে কি এপথে লোক চলাচল নেই ?

তবু এগিয়ে গেলাম। খুব বেশী দূর যেতে হলো না। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটি সাদা কুটীরের মূর্ত্তি ভেসে উঠলো। কাছে গিয়ে দেখলাম একটী সাদা চুণকাম করা পাকা দেয়ালের ঘর। কপাটের শিকলে তালা দেওয়া আছে। একটী কুঁয়ো রয়েছে সামনেই, জল তোলার জন্য একটী ডোল আর দড়ি রাখা আছে।

বোধ হয় কোন জলসত্র। কোন পুণ্যবান দানী মানুষের দয়ার

কীর্ত্তি। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য তবু দুটো পয়সা খরচ করে মাটী ফুটো করে রেখেছেন। এতটুকুই বা কজন করতে চায়?

কুঁয়ো থেকে একটু দূরেই একটা দোমহল বাড়ীর মত একটা কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে বাড়ীটার চেহারা ভাল মত কিছুই ঠাহর হয় না।

আমার অনুমান ভুল। দোমহল বাড়ী নয়। একটা প্রকাণ্ড পাথর। নিরেট ভোঁতা বধির একটা পাথরের চাপ যেন একলা অকারণে এখানে পড়ে আছে।

ভালই হলো। পাথরটার খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠলাম। কম্বল পাতলাম। শুয়ে পড়লাম।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। কৃষ্ণা তিথির চাঁদ উঠেছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ধূলির পৃথিবী ভরে গেছে। মাঠগুলিকে আর মাঠ বলে চেনা যায় না। হ্রদের জলের মত মাঠের বুকটা যেন তরল হয়ে টল্‌মল করছে। রাত্রির সান্ত্বনায় বাতাসের জ্বালাও একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। তাই ঝড়ো বাতাসের দাপাদাপি ফুরফুরে হাওয়ার চেয়ে ভাল লাগছিল।

তারপর কি হলো, শোন পুতুল। আজকের সকাল বেলার পাখীর ডাকে মুগ্ধ হয়ে আমি পথ ভুলে রূপকথার দেশে চলে গিয়েছিলাম, কিছুক্ষণের জন্য। দরজার বাইরে ভিখিরী ছেলের কান্না আমার সেই রূপকথার দেশ নষ্ট করে দিয়েছিল। সাসারামের পথে পথ ভুলে এই অজানা পাথরটার মাথার উপর শুয়ে আছি। জ্যোৎস্না রাত্রির ঝড়ো বাতাস আবার আমাকে এক নতুন রাজ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এখানে বসে বসে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা এখনো সব তৈরী হয়ে ওঠেনি। চারিদিকের সব বস্তু এখনো গলে নরম হয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে আছে। আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গড়ে উঠবে, এখনো অনেক দিন বাকী আছে।

শুধু আমি একা সবার আগে সেই যুগের প্রথম মূহূর্ত্ত হতে একটী কঠিন পাথরের ভেলায় ভাসছি।

কান্নার শব্দ। কে যেন কাঁদছে। থেকে থেকে, টেনে টেনে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, গুমরে।

এখানেও কান্না? এখানে মানুষ নেই, রূপলী বাষ্পে ভরা এই পৃথিবীতে এখনো যে মানুষ জন্ম নেয়নি। তবু মানুষের দুঃখটা আগে আগে চলে এসেছে। কী আশ্চর্য্য।

বড় করুণ হয়ে কান্নার শব্দটা বাজছিল। মাঝে মাঝে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটে কান্নার শব্দটাকে যেন অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই শুনছিলাম একেবারে কাছে, বাঁয়ে ডাইনে, নীচে—চারদিকে। ঠিক কোন্‌দিকে বুঝা যায় না।

নতুন রাজ্যের প্রথম রাজা হওয়ার সুখ ঘুচে গেল। কান্নাটা কমছিল না। বাকী রাতটা ছটফট করে ভয়ে ও অস্বস্তিতে কাটালাম।

তখন শেষ রাত্রি। পূবের আকাশ একটু ফর্সা হয়ে উঠেছে। পশ্চিমে লাল চন্দনের মত ঠাণ্ডা চাঁদ একেবারে মাঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। পাথরের ওপর থেকে নীচে নেমে পড়লাম।

কান্নার শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি জানি না। তখন ভোর হয়ে গেছে। আজকের মতই কাঁচা লাল রোদ ছড়িয়ে সূর্য্য উঠছিল।

পাথরের দিকে তাকাতেই চোখ পড়লো—একটা শিলালিপি লেখা রয়েছে। চমকে উঠলাম। তবে কি এটা মহারাজ অশোকের শিলালিপি? সেই প্রিয়দর্শী সন্ন্যাসী মহারাজ, যিনি লিখে গেছেন—মানুষ সুখী হবে সুখী হবে।

কান্নার শব্দটা বাজছে পাথরের অপর দিকে। কান্নাটাকে যেন গ্রেপ্তার করার জন্য পাথরটাকে পাক দিয়ে দুবার দৌড়লাম।

এতক্ষণে তাকে দেখলাম। পাথরটার দক্ষিণ কোণে একটা বড়

গহ্বর। ছোট গুহার মত যেন একটী আশ্রয়, ওপরে পাথরের ছাদ। সেই গহ্বরে এক ভিখারী মেয়ে বসে রয়েছে, তার কোলে একটী শিশু। সেই রাত্রে শিশুটীর জন্ম হয়েছে। ভিখিরী মেয়েটা একটু ভয় পেয়ে আর লজ্জিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

নবজাত একটী মানুষের প্রাণের কান্না আবার অস্থির হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। আমি জোর করে ভাববার চেষ্টা করলাম—কালকের রাত্রের জ্যোৎস্নায় এই পুণ্য পাথরের আশ্রয়ে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন।

কিন্তু আমার বার বার মনে পড়ছিল—একটা ভিখিরী জন্ম নিয়েছে। ভিখিরী মায়ের ছেলে একটা ভিখিরী।

আজকের চিঠি এইখানে শেষ করলাম, পুতুল। এর পরের চিঠিতে আর একটা গল্প পাঠাবো। বেশী দেরী করবো না। ঠিক সময়মত পাবে। ইতি মেজ-কাকু।

১লা বৈশাখ, ১৩৫১

———

গুরুদেবের চিঠি
এসে গেছে!

কাঁকুলিয়া। পয়লা জ্যৈষ্ঠ। স্নেহের পুতুল।

কদিন থেকে মনটা বড় ফুর্ত্তিতে আছে। কেন জান? মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আমরা যখন বয়সে তোমার সমান ছিলাম, তখন থেকেই আমরা মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছি। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই তিনি আমাদের মনের সাথী হয়েছিলেন। আজও তিনি তাই আছেন। তিনি আমাদের নেতা। তিনি বলেছেন, স্বরাজ হবে, আমরা স্বাধীন হব, সব মানুষ মুক্তি পাবে, পৃথিবী থেকে হিংসা দূর হবে। মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়লেই, আমাদের দেশের ইতিহাসের আর এক বিরাট পুরুষের নাম মনে পড়ে—মহারাজ অশোকের কথা। তিনিও ঠিক এই কথা বলেছিলেন এবং কাজে করেও ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, পাটলিপুত্রের এক পাথরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সেই সন্ন্যাসী মহারাজা অশোক যে-কথা বললেন, সারা পৃথিবীতে সেই কথার মায়া ছড়িয়ে গেল! মানুষে মানুষে, দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব করে কত বড় সুখী ও সুন্দর সভ্যতা তৈরি করা যায়, মহারাজা অশোকের ধর্ম্মরাজ্য তারই প্রমাণ। পৃথিবীতে এরকম রাজ্য আর তৈরি হয় নি। আজ আমাদের মহাত্মা গান্ধী আবার সেই কথা বলছেন।

আমি তখন বাংলা স্কুলে পড়ি। তখনকার সব কথা আ[illegible] আছে। বড় ভাল লাগতো স্কুলটাকে। গরমের ছুটির [illegible] হ'লে আমরা সবাই খুসী হতাম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী খুসী [illegible]ম যেদিন আবার স্কুল খুলতো। দেড় মাস পরে আবার ক্লাসে ফিরে গিয়ে সেই পরিচিত ডেস্কটিকে নতুন করে দেখতে কত ভাল লাগতো। ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা খড়ির লেখা পুরণো অঙ্কগুলি স্কুলের শিবুমালী ভাল করে মুছে রাখেনি। দেড়মাস পরে গিয়ে গিয়ে আমরা ব্ল্যাকবোর্ডের

সেই আব্‌ছা অঙ্কটাকে নিয়ে আবার হৈ-চৈ করতাম। দেড় মাস আগে এই ভালুকের নখের মত শক্ত বাঁকা অঙ্কটা আমাদের কী ভীষণ ভয় দেখিয়েছিল। অঙ্কটাকে তুচ্ছ ক'রে আমরা সেই ভয়ের প্রতিশোধ নিতাম। বার বার নতুন করে লিখতাম আর মুছে ফেলতাম। দেখতাম, স্কুলের আলমারীর ভেতর সেই ছোট গ্লোবটী নিঃশব্দে স্থির হয়ে আছে। তালাবন্ধ আলমারীর দরজাটা টেনে একটু ফাঁক ক'রে আমাদের ছোট হাত আলমারীর ভেতর জোর করে ঢুকিয়ে দিতাম। গ্লোবটাকে ঘুরিয়ে দিতাম। আবার দেড় মাস পরে আমাদের ছোট্ট পৃথিবীটা বন্ বন্ করে লাট্টুর মত ঘুরতে থাকতো, সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা বিভোর হয়ে যেতাম।

দলে দলে স্কুলের বাগানটাকে একবার টহল দিয়ে দেখে আসতাম আমরা, আমাদের সেই আমড়া গাছ, সেই কৎবেল গাছ। দড়িতে ঘটি বেঁধে স্কুলের কুঁয়ো থেকে অনবরত জল তুলতাম আর খেতাম। শিবুমালীর ধমক গ্রাহ্য করতাম না। দেড় মাস পরে আবার স্কুলের কুঁয়োটাকে হাতের কাছে পেয়েছি, আমরা যেন কুঁয়োটার কাছ থেকেও এই কদিনের বকেয়া পাওনা সুদসুদ্ধ আদায় করে ছাড়তাম।

স্কুলের সামনে রাস্তার ওপারে এক দক্ষিণী পণ্ডিত থাকতেন। বড় কঠিন পণ্ডিত। রোজ মাথা কামাতেন, নিজের হাতে রান্না করতেন আর দাওয়ায় বসে পুঁথি লিখতেন। এই পণ্ডিতের ঘরের পাশে একটী ফলের গাছ ছিল। এই ফলের ভাল নামটা যে কি, তা আজও আমি জানি না। আমরা বলতাম আঠাফল। দেখতে অনেকটা লটকা ফলের মত, খেতে মিষ্টি অথচ আঠায় ভরা। তাতে আমাদের খুব সুবিধাই হয়েছিল। রাস্তার চলন্ত রিক্সাগুলির গায়ে মুঠো মুঠো আঠাফল ছুঁড়ে মারতাম। ফলগুলি শামুকের মত রিক্সাগুলিকে যেন কামড়ে লেগে থাকতো। রিক্সাগুলি শেষ কালে এপথে আসাই ছেড়ে দিল।

কিন্তু ঐ মোটা দক্ষিণী পণ্ডিত। আঠাফল গাছের দিকে আমরা এক পা এগিয়ে যেতেই চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন, তার পরেই একটা গর্জ্জন করতেন এবং শেষে মারমূর্ত্তি হয়ে একখণ্ড সর্বদর্শণসংগ্রহ তুলতেন ছুঁড়ে মারবার জন্য। গরমের ছুটীর পর, দেড় মাস পরে আবার আমরা সেই নেড়ামাথা দক্ষিণী পণ্ডিতকে বড় খুসী হয়েই দেখতাম। আবার আঠাফল পাড়তাম। দক্ষিণী পণ্ডিত আবার গর্জ্জন করে সর্বদর্শণসংগ্রহ তুলতেন ছুঁড়ে মারবার জন্য। দেড় মাস পরে আবার তাঁকে রাগিয়ে আমাদের পুরণো আনন্দকে আবার ফিরে পেতাম।

সেই ছোট বাংলা স্কুল, কিন্তু আমাদের কাছে আকাশের চেয়েও বড়। এখানে এসেই আমরা সারা পৃথিবীর খবর শুনতাম। এই স্কুলের গল্পভরা আঙিনায় আমরা প্রথম শুনলাম, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মাথা এক লক্ষ টাকা দিয়ে গবর্ণমেণ্ট কিনে রেখেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মাথা। এই বাংলা স্কুলের প্রতিধ্বনির মধ্যেই আমরা প্রথম শুনতে পেলাম মোহনবাগানের কথা, যারা চোখে গামছা বেঁধে ফুটবল খেলতে পারে, গুনে গুনে একশোটা গোল না দিয়ে থামে না। এই ছোট বাংলা স্কুলের কানাকানির মধ্যেই আমরা প্রথম ভয়ে ভয়ে শুনলাম গোপিয়া ডাকাতের কথা—দামুয়া জঙ্গলের বাঘকে ট্রেনিং দিয়ে ডাকগাড়ী লুট করিয়েছে। আমরা শুনলাম, বেলিয়ান পাহাড়ে একজোড়া নতুন নাগ-নাগিনী দেখা দিয়েছে। এক বাটী দুধ রেখে দিলে চুপচাপ এসে খেয়ে চলে যায়। আমরা শুনলাম, ইচাক গ্রামে এক ধানক্ষেতের মাটীর নীচে একটী শ্বেত পাথরের তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, চোখ দুটো হীরের তৈরী।

হঠাৎ শুনলাম, আজ মহাত্মা গান্ধী আসছেন। আমাদের সহরের পাশ ছুঁয়ে গয়ারোড ধরে মোটর গাড়ীতে চলে যাবেন। দলে দলে লোক চলেছে গয়া রোডের দিকে। আমাদের ছোট

বাংলা স্কুলের বুকটা দুলে উঠলো। সেই মহাত্মা গান্ধী আসছেন। মহাসমুদ্রের ঝড়ের গল্পের মত তাঁকে আমরা শুধু শুনেছি। আজ তাঁকে দেখবো।

ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা বাজলো। আমরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম, এখুনি ক্লাসে গিয়ে বসতে হবে। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ড্রিল আর স্তোত্র—একে একে সারা দুপুরটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মহাত্মা গান্ধী ততক্ষণে চলে যাবেন।

ক্লাসে বসে জানালা দিয়ে বার বার তাকিয়ে আমরা দেখছিলাম—দলে দলে লোক জয়ধ্বনি করে চলেছে। দেখলাম, এই কঠিন নেড়ামাথা দক্ষিণী পণ্ডিতও পুঁথি গুটিয়ে রেখে চললেন, মহাত্মা গান্ধীকে দর্শন করতে। আমরাই শুধু বন্দী হয়ে পড়ে রইলাম।

আজ প্রথম আমাদের মনে হল, স্কুলটার হৃদয়ে কোন মমতা নেই। আমাদের বাংলা স্কুল এই প্রথম আমাদের ঠকালো।

হেড মাস্টার কৃষ্ণধন গুপ্তকে আমরা কেষ্ট স্যার বলতাম। কেষ্ট স্যার বড় কঠোর মানুষ। একদিনের জন্য তাঁকে স্কুল কামাই করতে দেখিনি। কখনো ছুটি নিতেন না। জ্বর হলেও কম্বলমুড়ি দিয়ে ক্লাস করতেন।

রোগা লম্বা কালো লাল-চোখ কেষ্ট স্যার। মহাত্মা গান্ধীর কোন ধার ধারেন না। তিনি পৃথিবীতে বোধ হয় কাউকে চেনেন না, শুধু সেক্রেটারী মিত্তির বাবুকে ছাড়া।

তবু আমরা ক'জন সাহস করে অঙ্ক পণ্ডিতের কাছে হুকুম নিয়ে কেষ্ট স্যারের ঘরের দিকে চললাম। নিজের ঘরে বসে কেষ্ট স্যার তখন তামাক খাচ্ছিলেন।

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম।—স্যার, ছুটি চাই স্যার।

কেষ্ট স্যার তাঁর হুঁকোর মতই গর্‌গর্‌ করে উঠলেন।—ছুটি? ছুটি কিসের রে হতভাগা?

আমরা।—স্যার গান্ধী আসছেন স্যার। আমরা স্যার দেখতে যাব স্যার।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই রেগে গিয়ে কেষ্ট স্যার চীৎকার করে উঠলেন।—বেরো, বেরো এখান থেকে। ঠ্যাং খোঁড়া করে ছেড়ে দেব, মুখ থেকে যদি আবার এসব জঘন্য কথা শুনেছি।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেষ্ট স্যার মুখ ভেংচে বলতে লাগলেন।—মহাত্মা? নেংটি পরলে সব ব্যাটাই মহাত্মা হয়, আর চাক্‌রী না পেলে সব ব্যাটাই নেংটি পরে।

আমাদের মধ্যে অজিতের ভয় ডর একটু কম ছিল। অজিত গম্ভীর হয়ে বললো।—গালাগালি দিচ্ছেন কেন স্যার।

অজিতের মন্তব্যটা যেন স্যারকে বোলতার মত কামড়ে দিল। রাগের জ্বালায় পাগল হয়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে এলেন। অজিতের চুলের ঝুঁটি ধরে দমাদম মারতে লাগলেন। তার পরেই একটা হাঁপ ছেড়ে কেষ্ট স্যার চীৎকার করলেন।—বেরো, বেরো এখান থেকে শীগ্‌গির।

অজিতের মার খাওয়া দেখে আমাদের ভয় বরং ভেঙে গেল। আমি বললাম।—স্যার, হাফ-ডে চাইছিলাম স্যার, আজ স্যার, ড্রিলটা থাক স্যার।

কেষ্ট স্যার আবার ক্ষেপে উঠলেন! খপ্‌ করে আমার কানটা শক্ত করে ধরে ওপর দিকে টানতে লাগলেন। আমি দু'পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে হাল্‌কা হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কেষ্ট স্যার দাঁত চিবিয়ে বললেন—কেন রে শুয়ার? মহাত্মা গান্ধী তোদের কে?

হঠাৎ তারাপদ বলে ফেললো—নেতা স্যার।

সেই মুহূর্ত্তে আমার কানটা কেষ্ট স্যারের থাবা থেকে মুক্ত হলো। তারাপদর কানটাকে চিমটি দিয়ে ধরলেন কেষ্ট স্যার।—নেতা? তাতে তোর কি রে নরাধম? গান্ধীকে দেখে তোর পেরমায়ু বাড়বে রে?

প্রভাত বললো—পুণ্যি হবে স্যার।

তারাপদকে ছেড়ে দিয়ে কেষ্ট স্যার প্রভাতের গলা টিপে ধরলেন। তার পরেই ঘাড় ধরে একে একে সবাইকে ধাক্কা দিতে লাগলেন—বেরো, বেরো এখান থেকে।

আমরা ফিরে গিয়ে চুপ করে অঙ্কের ক্লাশে বসলাম। কি আর করতে পারি আমরা! প্রতিশোধ? প্রতিশোধ নেবার কোন দুঃসাহস আমাদের ছিল না। আমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু?

কিন্তু ঘটনাটা ক্লাসে ক্লাসে রটে গেল। কোন ক্লাসে আর ভাল করে পড়া জমছিল না। হঠাৎ সমস্ত স্কুলটা একেবারে শান্ত শব্দহীন হয়ে রইল। পণ্ডিতমশাইরাও চুপ করে ছিলেন। টিফিনের ছুটিটাও নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে, আমাদের ইতিহাসের ক্লাসে ঢুকে প্রথম শব্দ করলেন কেষ্ট স্যার।

পড়াতে পড়াতে কেষ্ট স্যার এক একবার থেমে যাচ্ছিলেন। গম্ভীরভাবে রাস্তার জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন, শেষে পড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন—গান্ধী আসছে, সেখানে তোমাদের যেতে নেই। গভর্ণমেণ্ট রাগ করবে।

আমরা কিন্তু তখন আর ছট্‌ফট্‌ না করে চুপ করেই বসে ছিলাম। কেষ্ট স্যারই একটা খড়ির টুক্‌রো তুলে ব্ল্যাক্‌বোর্ডের ওপর জোরে ছুঁড়ে মারলেন। বললেন—সাবধান!

আবার হঠাৎ গর্জ্জন করে উঠলেন—কী এমন একটা লোক গান্ধী, যাকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে হবে।

কেষ্ট স্যারের ওপর রাগ করবার কথাও মনে ছিল না আমাদের। আমরা শুধু ইতিহাসের পাতা খুলে তখন মনে মনে দেখছিলাম—কাতারে কাতারে লোক গয়া রোডের দু'পাশে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি করছে। মহাত্মা গান্ধীর মোটর গাড়ী আসছে। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

ঘণ্টা বাজ্‌লো। বিকেলের রোদে স্কুলের উঠোনে আমরা ড্রিল করার জন্য দাঁড়ালাম। কেষ্ট স্যার ছাতা মাথায় দিয়ে ছড়ি হাতে হাঁক দিলেন—অ্যাটেন্‌ সন্‌!

শিবু মালী হঠাৎ কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অজিতের কানে কানে কি একটা কথা বল্‌লো।

কেষ্ট স্যার ধমক দিয়ে উঠলেন।—এই, কি হচ্ছে? অ্যাটেন্‌ সন্‌।

অজিত চীৎকার করে উঠলো—স্যার মহাত্মা গান্ধী এক্ষুনি চলে গেলেন স্যার।

কেষ্ট স্যার লাল চোখ পাকিয়ে তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন।—তাতে, তাতে তোর কি রে বন্যগর্দভ?

অজিত। — আকাশ থেকে মিষ্টি বৃষ্টি হয়েছে স্যার। শিবু দেখে এসেছে। ছোট ছোট এলাচ দানার মত মিষ্টি।

কেষ্ট স্যার। — অ্যাঁ, কি বললি?

অজিত। — মিষ্টি বৃষ্টি স্যার। গয়া রোডের দু'দিকে মাঠের ওপর স্যার। ঝুর ঝুর করে শুধু মিষ্টি ঝ'রে পড়ছে!

মিষ্টি বৃষ্টি! মিষ্টি বৃষ্টি! মিষ্টি বৃষ্টি! একশো ছাত্রের হঠাৎ উল্লাসে স্কুলের বাড়ীটা অস্থির হয়ে উঠলো। সব ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বই খাতা শ্লেট পড়ে রইল। ছেঁড়া জালের মাছের মত আমরা এক সঙ্গে দৌড় দিলাম গয়া রোডের দিকে।

কেষ্ট স্যার তারস্বরে চীৎকার করছিলেন—ওরে যাস্‌নি, যাস্‌নি। শিবুমালী গাঁজা খায়, এসব গুজবে বিশ্বাস করিস্‌নি।

মাঠের ওপর দলে দলে ভাগ হয়ে আমরা মিষ্টি খুঁজছিলাম। ঘাসের ওপর সাদা সাদা কিছু দেখতে পেলেই আমরা সেদিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছিলাম। মহাত্মা গান্ধী চলে গেছেন, তাঁকে দেখতে পেলাম না। যাক্‌, আকাশ থেকে [illegible] বৃষ্টি হয়েছে। এই মিষ্টি আমাদের চাই। দোড়ে দৌড়ে লাফ[illegible] চেঁচিয়ে, [illegible] দিয়ে

আমরা ঘাসের ওপর মিষ্টি খুঁজছিলাম, ছোট ছোট এলাচ দানার মত মিষ্টি।

—পেলি নাকি রে কিছু? অ্যাঁ?

হঠাৎ চম্‌কে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, কেষ্ট স্যারও এসে গেছেন। আমাদের আনন্দের চীৎকারে মাঠের বাতাস মাতিয়ে তুলছিল, দলে দলে চীৎকার করে আমরা উত্তর দিলাম।—হ্যাঁ স্যার পাওয়া যাচ্ছে স্যার।

কেষ্ট স্যার ব্যস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—কই, কোথায় কোন্ দিকে?

অজিত এক দৌড়ে মাঠের দক্ষিণ দিকে একটা জায়গা লক্ষ্য করে ছুটে যেতে যেতে বললো—এই দিকে স্যার! আসুন স্যার।

কেষ্ট স্যার অজিতের পেছু পেছু দৌড়লেন।

পরমুহূর্ত্তে আমি পশ্চিম দিকে দৌড়ে যেতে যেতে চীৎকার করলাম।—এইদিকে স্যার, ঐ যে দেখা যাচ্ছে, আসুন স্যার।

কেষ্ট স্যার অজিতকে ছেড়ে দিয়ে আমার পেছু পেছু দৌড়ে আসতে লাগলেন।

ওদিকে তারাপদ প্রচণ্ড চীৎকার করে উত্তর দিকে দৌড়ে গেল—আসুন স্যার, এইদিকে আমার সঙ্গে স্যার।

কেষ্ট স্যার থম্‌কে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্ত্তে আমার দিকটা ছেড়ে দিয়ে দম টেনে টেনে তারাপদর পেছু ধরে ছুটে চললেন।

প্রভাত চেঁচিয়ে উঠলো—পেয়ে গেলাম স্যার।

কেষ্ট স্যার হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে তাকালেন—কই, কোন্ দিকে রে?

প্রভাত সোজা পূব দিকে দৌড়তে আরম্ভ করলো।—এইদিকে স্যার।

কেষ্ট স্যার একেবারে ক্লান্ত শরীর নিয়ে জোর করে কষ্টেসৃষ্টে প্রভাতের পেছু পেছু খোঁড়া জিরাফের মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে কোন মতে দৌড়ে যেতে লাগলেন—কই ? কই ? কোন্ দিকে রে ?

আজকের মত চিঠি শেষ করলাম পুতুল। কেষ্ট স্যারের কথা আর কী বলবো! তিনি বোধ হয় তখনো বুঝতে পারেন নি যে আমরা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছি।

প্রভাতের পেছু পেছু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়চ্ছিলেন, রোগা লম্বা কালো লালচোখ কেষ্ট স্যার। তখনো তিনি বিশ্বাস করে মাঝে মাঝে সবার দিকে করুণভাবে তাকাচ্ছিলেন। আমার মনে হলো, কেষ্ট স্যার এখন নিশ্চয় মনে মনে বলছেন—এইবার ছেড়ে দে রে বাবা, যা পাওয়ার পেয়ে গেছি। ছোট ছোট এলাচদানার মত মিষ্টি! কিন্তু কী ভয়ানক মিষ্টি!

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

দুষ্টুদের চিঠি
এ দেখ কুকুরের
বই ও
খুব ভো
দেখ
দেখ
না!

কাঁকুলিয়া। পয়লা আষাঢ়। স্নেহের পুতুল।

আজ কিসের গল্প শুন্‌তে ভাল লাগবে, পুতুল? আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু এইমাত্র আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আষাঢ়ের কোন চিহ্ন নেই। এখনো আকাশে বৈশাখ মাসের রাগ জ্বল্‌ছে। বেশ গরম পড়েছে। লোকের মুখে শুনছি—ধান পুড়ে গেল, ধান পুড়ে গেল। একেই বলে, গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই। বাংলা দেশের জল মাটী বাতাস কেন জানি বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে। তোমার মত কত শত শত মেয়ে, কত আশা করে, কত বসুধারা ব্রত করলো, নেচে নেচে ছড়া গাইলো, গাছের মাথায় জল ঢাল্‌লো। তবু আজও মাঠের বুকে একটা জলভরা মেঘের ছায়া পড়লো না। এস বৃষ্টি, এস বৃষ্টি—সারা দেশের প্রাণ অসহায়ের মত শুধু প্রার্থনা করছে। তাই, আজ আষাঢ়ে গল্প কিছু মনে আসছে না। অনেক বছর আগের আষাঢ় মাসের একটা দিনের গল্প বলতে পারি, আমাদের ধরণী পণ্ডিত যেদিন একেবারে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বড় গম্ভীর আর বড় উদার ছিলেন ধরণী পণ্ডিত। সব সময় কি ভাবতেন। অম্বলের রোগীর মত তাঁর চেহারাটা সব সময় বড় শুক্‌নো দেখাতো।

ষ্টীফান সাহেবের বাগানের পাশে তখন আমাদের নতুন বাংলা স্কুল তৈরী হয়েছে। টীচারদের থাক্‌বার জন্য ছোট একটী কাঁচা গাঁথুনির ব্যারাক তৈরী হয়েছে। আমাদের গরীব স্কুলটার বোধ হয় কিছু টাকা জমেছিল। দেখলাম, আমাদের খেলার মাঠে আলকাত্‌রা-মাখা বাঁশের গোলপোষ্টও তৈরী হয়ে গেল। খুব খুসী ছিলাম আমরা। দেখে আরও খুসী হলাম, নতুন কুঁয়ো তৈরী আরম্ভ হয়েছে। ঠিকেদারের কুলিরা এসে রোজ মাটী কাটে, ঝুড়ি ঝুড়ি দুধিয়া মাটী, কাঁকর আর রঙ বেরঙের পাথর ওঠে। জল বের হতে তখনো অনেক দেরী।

নতুন স্কুলে ক'জন নতুন টীচার এলেন। প্রথম এলেন ধরণী পণ্ডিত, তারপর এলেন চিত্তদা। টীচারের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে ছোট ছিলেন এঁরাই দুজন। আমরা দেখতাম, ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা, দুই সমবয়সীতে মিলে একই উনুনে আর হাঁড়িতে রান্না বান্না করেন, একই সঙ্গে দু'জনে হাটে জিনিস কিনতে বের হন। এক সঙ্গে বসে দু'জনকে গল্প করতেও শুনেছি। গল্প করার সময় চিত্তদা খুব হাসতেন। কিন্তু ধরণী পণ্ডিত কখনো হাসতেন না। চিত্তদা খুব জোরে জোরে কথা বলতেন, ধরণী পণ্ডিত এত আস্তে বলতেন যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললে আমরা শুধু তাঁর মুখনাড়াটুকুই দেখতে পেতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম, ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা ভিন্ন হয়ে গেলেন। দু'জনেই ভিন্ন উনুনে রান্না করেন। একসঙ্গে বসে গল্প দু'জনকে করতেও আর দেখিনি!

পড়াতে পড়াতে একদিন ধরণী পণ্ডিত হঠাৎ শরতের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন — তোমার আঙুলে ওটা কি?

আমরা তাকিয়ে দেখলাম, শরতের আঙুলে একটা সোনার আংটি, তার মধ্যে একটা দামী পাথর বসানো।

ধরণী পণ্ডিত আবার বললেন — ওটা কিসের পাথর?

শরৎ — পোখ্‌রাজ, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত — খুলে রেখে দিও। ওসব প'রতে নেই। ভয়ানক খারাপ জিনিস।

শরৎ — বড়দি উপহার দিয়েছেন, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত বেশ গম্ভীর হয়ে শক্ত করে বললেন — যেই উপহার দিক্, ওসব প'রে স্কুলে এস না।

শরৎ — কেন, পণ্ডিত মশাই?

ধরণী পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বললেন — অমঙ্গল হয়।

ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিতের ক্লাস শেষ হলো। এইবার এলেন চিত্তদা।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিজ্ঞেসা করলাম — আংটীতে দামী পাথর থাকলে অমঙ্গল হয় নাকি, চিত্তদা ?

চিত্তদা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন — কেন ? কি হয়েছে ?

আমরা উত্তর দিলাম — ধরণী পণ্ডিত মশাই বলছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চিত্তদা বললেন — মিথ্যে কথা। আমি জানি, খুব মঙ্গল হয়।

পরের দিন ক্লাসে আবার শরতের আংটীর দিকে তাকালেন ধরণী পণ্ডিত। তাঁর মুখটা হঠাৎ আরো বিমর্ষ হয়ে উঠলো। আমরা ভাবছিলাম, তিনি হয়তো রাগ করে আবার ধমক-ধামক করবেন। কিন্তু অবাধ্যতার জন্য শরৎকে কিছুই বললেন না ধরণী পণ্ডিত। নিজের মনে পড়িয়ে যেতে লাগলেন — দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে··· ।

আমাদেরই অস্বস্তি হচ্ছিল। মায়া হচ্ছিল। রাগ করে একটা কথাও কেন বললেন না ধরণী পণ্ডিত ?

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করার জন্য যেই পড়া থামিয়েছেন ধরণী পণ্ডিত, অমনি আমরা বলে ফেললাম — চিত্তদা বলছিলেন··· ।

ধরণী পণ্ডিত একটু আগ্রহ করে বললেন — কি বলছিলেন ···?

—তিনি বলছিলেন যে, দামী পাথর টাথর প'রলে খুব মঙ্গল হয়।

বই বন্ধ করে ধরণী পণ্ডিত আর একবার কেশে নিলেন। তারপর বললেন — শোন।

আমরা শুনতে আরম্ভ করলাম — 'অনেক যুগ আগে পৃথিবীতে বল নামে এক অসুর ছিল। এই বলাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত হারিয়ে দিয়েছিল। শেষকালে দেবতারা একটা যজ্ঞের আয়োজন করলেন। কয়েকজন দেবতা বলাসুরের কাছে গিয়ে বললেন যে — আমাদের যজ্ঞে উৎসর্গ করার জন্য কোন পশু খুঁজে পাচ্ছি না, আপনার

শরীরটা আমাদের ভিক্ষে দিন। বলাসুর খুশী হয়ে পশুরূপ ধারণ করে দেবতাদের যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করে। দেবতারা বলাসুরের মৃতদেহটা নিয়ে আনন্দে আকাশপথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় বলাসুরের শরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে পৃথিবীর নদী সমুদ্র পর্ব্বত ও জঙ্গলের ওপর পড়তে লাগলো। সেই বলাসুরের হাড়ই হলো রত্ন। মণিমুক্তা, পদ্মরাগ, মরকত, নীলা, যত রকম রত্ন বা দামী পাথর পৃথিবীতে আছে, সবই হলো বলাসুরের হাড়।'

এত গম্ভীর ভাবে ও এত শান্ত হয়ে গল্পটা বললেন ধরণী পণ্ডিত যে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। গল্পটার মধ্যে যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি একটা আবছা ভয়ও লুকিয়েছিল। বলাসুরের হাড়, দেবতাদের যজ্ঞে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর টুকরো টুকরো হয়ে আকাশ থেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। হীরা নীলা পদ্মরাগ মরকত হয়ে মাটী আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে বলাসুরের হাড়। সত্যিই ছুঁতে একটু ভয় হয়।

আমরা বললাম — পণ্ডিত মশাই, তাহ'লে শরতের আংটীর এই পোখ্‌রাজটাও বলাসুরের হাড়।

ধরণী পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেন — নিশ্চয়।

ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিতের ক্লাস শেষ হলো। চিত্তদা পড়াতে এলেন।

আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলাম — বলাসুরের হাড় দেখেছেন চিত্তদা? বলাসুরের হাড়?

চিত্তদা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে তারপর বললেন — না, আমি কখনো দেখিনি।

—এই যে রয়েছে চিত্তদা। শরৎ একলাফে চিত্তদার সামনে গিয়ে আংটীটা দেখালো। আমরা চিত্তদাকে একটা নতুন বিদ্যা যেন

শেখাচ্ছিলাম। সবাই মিলে বলতে লাগলাম — এই যে চিত্তদা, এই পোখরাজটাই হলো বলাসুরের হাড়।

চিত্তদা — কে বললে ?

—ধরণী পণ্ডিত মশাই বললেন।

চিত্তদা যেন ধমক দিয়ে বললেন — মিথ্যে কথা। বলাসুরের হাড় নয়। ওটা একটা দামী পাথর।

আমরা জিজ্ঞেসা করলাম — পৃথিবীতে কোত্থেকে এই পাথর এল, চিত্তদা ?

চিত্তদা বললেন — শোন।

আমরা শুনতে লাগলাম — 'কোটী কোটী বছর আগে পৃথিবীটা ছিল যেমন নরম তেমনি গরম। সেই তরল পৃথিবী শুধু টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতো, ওপরটা দুধের সরের মত জুড়িয়ে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা ও শক্ত হতো, আবার ভেঙে পড়তো। আবার উথলে উঠতো। সেই বিরাট গলিত বস্তুর ক্ষীরে কখনো ঘূর্ণি জাগতো, কখনো স্রোতের গড়ানি লাগতো। তাপে চাপে আর আঘাতে কখনো দানা বেঁধে, কখনো চূর্ণ হয়ে, কখনো বা থাকে থাকে পাট হয়ে সেই বস্তুর ক্ষীর শক্ত হয়ে উঠলো। তারই মধ্যে আমাদের পৃথিবীর পাথরের খনিটী তৈরী হয়ে গেল। সব পাথরই এভাবে তৈরী হয়েছে। পথের খোয়া পাথর বা শরতের আংটীর এই পোখরাজ পাথর, ঐ একই ইতিহাস, একই জিনিস। কোনটা খুব বেশী করে পাওয়া যায়, কোনটা খুব কম।'

চিত্তদার গল্পের শেষটা আমাদের ভাল লাগলো না। গল্পের শেষের দিকে একটু চম্‌কে না উঠলে বড় খারাপ লাগে। কিন্তু চিত্তদা বড় সাদাসিধে ভাবে গল্পের শেষটা এবং সেই সঙ্গে শরতের পোখরাজটাকেও যেন মাটী করে দিলেন। সোজা কিনা বলে দিলেন — রাস্তার পাথর আর পোখরাজ একই জিনিস ! আমাদের সন্দেহ হলো।

আমরা বললাম — সত্যিই কি একই জিনিষ চিত্তদা? তবে হীরের দাম কেন···।

চিত্তদা বললেন — একেবারে এক জিনিস। চূণ, কয়লা, কালি হীরা, নীলা, ফিরোজা, পোখরাজ, ওসব একই জিনিষ। সবই কাজের জিনিষ, সবই ভাল জিনিষ, সবই মঙ্গলের জিনিষ। যেটা কম ক'রে পাওয়া যায় তার দাম বেশী, আর যেটা বেশী ক'রে পাওয়া যায় তার দাম কম।

ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা যদিও নতুন টীচার, তবু আমরা কিছু-দিনের মধ্যে অনেক খবর জেনে ফেললাম। একটু দুঃখ হতো ধরণী পণ্ডিতের জন্য। খুব বড়লোকের ছেলে ছিলেন ধরণী পণ্ডিত, কিন্তু আজ তার দেশের ভিটে পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে দেনার দায়ে। রোগ নেই, তবু ভয়ানক রোগীর মত দেখতে। কারও সঙ্গে মেশেন না, হাসেন না। কোন মেলামেশা বা উৎসবে তাঁকে দেখতে পাই না। শুধু ভেবে ভেবেই যেন রুগিয়ে গেছেন ধরণী পণ্ডিত মশাই।

সপ্তাহের মধ্যে মাত্র একটি দিন ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের মুখটা বেশ হাসি হাসি দেখাতো। প্রত্যেক শনিবার বিকেল বেলায় তিনি স্কুলের ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে বের হতেন। সোজা চলে যেতেন ইংলিশ রোড ধরে, কতগুলি বই আর ফুল হাতে নিয়ে।

আমরা জানতাম, তিনি কোথায় যেতেন। ইংলিশ রোডের ওপরেই ছোট একটা বাংলোর মত বাড়ী ছিল, নাম ছায়াবীথি। বাড়ীটার ফটকে দুটো ফর্সা চেহারার কচি ইউকালিপ্‌টাস্ ছিল। আমাদের বই খাতা সুগন্ধ করার জন্যে আমরা মাঝে মাঝে ছায়াবীথির ইউকালিপ্‌টাসের পাতা ছিঁড়ে আনতে যেতাম। বাড়ীটার একটা জানালা দিয়ে প্রায় সব সময় খুব সুন্দর সেতার বাজনার শব্দ শোনা যেত। আমরা জানতাম, নিভাদি সেতার বাজাচ্ছেন। ইউকালিপ্‌টাসের পাতা ছিঁড়তে দেখেও নিভাদি কখনও আমাদের বক্‌তেন না।

বরং জিজ্ঞাসা করতেন—তোমাদের ধরণী পণ্ডিত মশাই কেমন আছেন ?

প্রত্যেক শনিবারে এই ছায়াবীথিতেই বেড়াতে আসতেন ধরণী পণ্ডিত মশাই। হঠাৎ একটা খবর শুনে আমরা একদিন ছায়াবীথিতে এসে একেবারে জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম—নিভাদি !

নিভাদি বললেন—কি ?

আমরা বললাম—এবার থেকে আপনাকে গুর্বী বলে ডাক্‌বো নিভাদি।

নিভাদি বললেন—কেন ?

আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম—আপনি একটুও বাংলা ব্যাকরণ জানেন না নিভাদি !

কানু ব'লে ফেল্‌লো—ধরণী পণ্ডিত মশাই যদি আমাদের গুরু হন, তবে আপনি হলেন·····।

নিভাদি গম্ভীর হয়ে বললেন—একরকম কথা বলতে নেই।

কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না, বলতে দোষ কি ? হেড মাস্টার মশাইকেই তো আমরা বলতে শুনেছি, ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে নিভাদির বিয়ের কথা হচ্ছে। হ'লেই তো ভাল।

চিত্তদার জন্য আমাদের কোন দুঃখ নেই, যদিও খুব গরীব লোকের ছেলে চিত্তদা। অল্পদিনের মধ্যে সহরের সবাই তাঁকে চিনে ফেলেছে। শুনলাম, এইবার বড়দিনে নববান্ধব সমিতি যে চন্দ্রগুপ্ত থিয়েটার করবে, তাতে চিত্তদাই সেকেন্দারের পার্ট নিয়েছেন। চিত্তদার খ্যাতি শুনে আমরা খুশীই হতাম। কিন্তু ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের জন্য মায়া হতো। চন্দ্রগুপ্তের প্লে'তে ধরণী পণ্ডিত মশাইকেও ইচ্ছে করলে একটা পার্ট নিশ্চয় দেওয়া যায়। চাণক্যের পার্টে খুবই ভালো মানাতো তাঁকে, যদি শুধু তিনি একটু রাগতে জানতেন। কিন্তু ধরণী পণ্ডিত মশাই বড়

উদাস, বড় বিষণ্ণ আর বড় আস্তে আস্তে কথা বলেন। একেবারে রাগতে পারেন না, চেঁচাতে পারেন না।

চন্দ্রগুপ্ত থিয়েটার হয়ে যাবার কিছুদিন পর আমরা একটা উল্‌টো খবর শুনলাম। নিভাদির সঙ্গে নাকি চিত্তদারই বিয়ে হবে। সনাতনের বাবা হেড মাষ্টার মশাইকে এই কথা বলছিলেন।

আবার আমরা একদিন ছায়াবীথির জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম—নিভাদি।

নিভাদি বললেন—কি খবর ?

আমরা বললাম—এবার থেকে আপনাকে মিস্‌ট্রেস্ বলে ডাকবো নিভাদি।

নিভাদি খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন—কেন ?

আমরা বললাম—আপনি একটুও ইংরেজী গ্রামার জানেন না নিভাদি।

কানু বলে ফেললো—চিত্তদা যদি আমাদের মাষ্টার হন, তাহ'লে আপনি হলেন·····।

নিভাদি প্রথমে হেসে ফেললেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা, এ দু'জনের মধ্যে কে ভাল বল তো ?

আমরা সবাই বললাম—চিত্তদা ! চিত্তদা !

শুধু ইউকালিপ্‌টাসের পাতা নয়, ছায়াবীথির কতগুলি নতুন পপি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে এলাম আমরা। নিভাদি একটুও আপত্তি করলেন না।

সেদিন মাইকেলের কবিতা পড়াচ্ছিলেন ধরণী পড়িত মশাই—মাটি কাটি লভি কোহিনুর···।

হঠাৎ পড়া বন্ধ করে ধরণী পণ্ডিত বললেন—এইখানে হঠাৎ একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলেছেন মাইকেল। মাটী কেটে কখনও কোহিনুর

পাওয়া যায় না, কোন রত্নই কখনো পাওয়া যায় না। কত লোকে সারা জীবন ধরে রত্ন খুঁজে খুঁজে শেষে পাগল হয়ে গেছে। লোকে ভুল করে বলাসুরের সুন্দর সুন্দর হাড় ঘরে এনে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে। কিন্তু একদিন না একদিন সেই রত্ন হারিয়ে যায়। রত্ন কারো আপন হয় না। তাকে পাওয়া যায় না, পেলেও থাকে না! যে জিনিষকে রত্ন বলে মনে করবে, সেই জিনিষই হারিয়ে যাবে। রত্ন কথাটাই অমঙ্গলের কথা।

কথা বলার সময় ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ দুটো কেমন যে ছল্‌ছল্‌ করছিল। ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিত মশাই ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন।

ক্লাসে ঢুকলেন চিত্তদা। আমরা বললাম—মাইকেল মিথ্যে কথা লিখে গেছেন চিত্তদা। 'মাটী কাটি লভি কোহিনুর' হয় না। রত্ন কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না।

চিত্তদা—কে বললে?

—ধরণী পণ্ডিত মশাই বলছিলেন।

চিত্তদা—মিথ্যে কথা। আমি জানি, খুঁজলেই রত্ন পাওয়া যায়। কিন্তু খোঁজবার মত মন বুদ্ধি ও সাহস থাকা চাই।

আমরা বললাম—আমাদের মন বুদ্ধি সাহস সবই আছে চিত্তদা, আমরাও খুঁজলে রত্ন পাব তো?

চিত্তদা বললেন — হ্যাঁ। তবে তার সঙ্গে একটা কৌশলও জানা চাই।

আমরা বললাম—কৌশলটা আমাদের বলে দিন চিত্তদা।

চিত্তদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন—শোন।

আমরা শুনতে লাগলাম—একটা জিনিষ শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এর নাম আল্‌ট্রা-ভায়লেট ল্যাম্প। টর্চের কাঁচ খুলে ফেলে সেখানে একটি নীল রঙা কাঁচ বসিয়ে নেবে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে যেখানে ভাঙা

পাথর নুড়ি দেখবে, তার ওপর টর্চ্চের আলো ফেলে দেখবে। এইভাবে খুঁজতে থাকবে। হঠাৎ হয়তো দেখবে কোন একটা নুড়ি থেকে সবুজ আলো ঠিকরে পড়েছে। তখুনি সেই সবুজ আলোটাকে গিয়ে চেপে ধরবে। এই সবুজ আলোর নুড়িটাই হয়তো মরকত। আবার হঠাৎ দেখবে একটা খুব শান্ত পাত্‌লা নীল আলো···।

বাস্‌, আর কোন সন্দেহ নেই, চিত্তদাকে আজ আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করছিলাম! চিত্তদার কথায় আজ যত অবহেলার মাটী নুড়ি আর পাথর যেন রত্ন হয়ে গেছে। উপদেশটা আমাদের ধ্যানের মত হয়ে উঠলো। সকলেই এক একটা টর্চের মুখে নীল কাঁচ জুড়ে দিয়ে আল্‌ট্রা-ভায়লেট ল্যাম্প তৈরী করে ফেললাম। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, যদি কোনো মতে একটা রাত্রিতে অন্ততঃ দু'ঘণ্টার জন্য বাইরে বের হবার সুযোগ পাই, তবে···।

সুযোগ পেয়ে গেলাম আমরা জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যাবেলা। হরিসভায় কীর্ত্তন শুনবার অনুমতি পেলাম বাড়ী থেকে। বিধু বলাই মন্টি কানুও এল। আমরা ছোট একটি রত্ন শিকারীর দল, নীল কাঁচের টর্চ নিয়ে বড় ঝিলের পাশ দিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে দৌড়ে চলে গেলাম। মাঠে নামলাম। আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা দেবদারুর বাগান পার হলাম। তার পরেই গিয়ে দাঁড়ালাম কোনার নামে একটি পাহাড়ী নদীর বালিয়াড়ীর ওপর। ঝিরঝির করে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। অজস্র কালো কালো নুড়ি ছড়িয়ে আছে, যেন গাদা গাদা অন্ধকারের কুঁড়ি ঝরে পড়ে রয়েছে চারদিকে।

এক সঙ্গে পাঁচটা নীল কাঁচের টর্চের আলো ফেলে পা টিপে টিপে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছিলাম। কেউ কথা বলছিলাম না। শব্দ করে ফেললে, রত্নগুলি যেন নিভে যাবে। পায়ে মশা কামড়াচ্ছিল, চোখে পোকা উড়ে এসে পড়ছিল, কাঁকর বিঁধছিল, হোঁচট খাচ্ছিলাম। তবু আমাদের

ধৈর্য্য ঠিক ছিল। রত্নশিকার করতে চলেছি, আর এতটুকু কষ্ট সইতে পারবো না ?

একটি ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। পায়ের তলায় নুড়িগুলি বেশ জোরে শব্দ করে মড়্‌মড়্‌ করছিল। সামনে পেছনে দু'পাশে ভোঁতা ভোঁতা ভাঙা ভাঙা বিশ্রী বেরসিক যত নুড়ি স্থির হয়ে পড়ে আছে। আমাদের হাতের নীল কাঁচের টর্চগুলি সেই নিঃস্ব নুড়ির পৃথিবীতে ঐক অপ্রাপ্যের আশায় বৃথাই ঘুরে মরতে লাগলো।

কানু হঠাৎ রাগ করে বলে ফেললো—ঘেঁচু, চিত্তদা ভয়ানক মিথ্যাবাদী।

মন্টি হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে সাপের মত শুধু নিশ্বাস দিয়ে হিস্‌হিস্‌ করে বললো—ঐ যে, ঐ যে, চুপ চুপ চুপ !

সবাই চুপ করে গেলাম, আমাদের বুকের ভেতর নিশ্বাস লাফাতে আরম্ভ করলো। একটু দূরে জলে ভেজা একটা নুড়ির গাদার ওপরে ঝক্‌ঝকে সবুজ একটা আলো ফুটে রয়েছে। শিকারীর বন্দুকের মত লক্ষ্য ঠিক রেখে মন্টি তার টর্চ ধরে আনন্দে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। বিধু বললো—মরকত মরকত ! সবুজ আলো !

বলাই ধমক দিয়ে বললো—চেঁচিয়ো না।

এক পা দু'পা করে সেই সবুজ দ্যুতিময় মরকতকে বন্দী করার জন্য আমরা হাত তুলে এগিয়ে চললাম। বিধু পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে প্রস্তুত হয়ে রইল।

সবুজ আলোটাকে খপ করে ধরতে গিয়েই চমকে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সবাই তাকিয়ে রইলাম সেই সবুজ রহস্যের দিকে। কেন্নোর মত চেহারা, দু' ইঞ্চি লম্বা একটা পোকা। গায়ে আঠার মত কি লেগে আছে। পোকাটা শান্ত হয়ে গুটিয়ে পাকিয়ে

পড়েছিল। আমাদের সব কৌতুহলকে ধন্য করে দিয়ে পোকাটা ছোট্ট একটা শুঁড় তুলে একবার নড়ে উঠলো।

তখুনি ফিরে গেলাম আমরা। অন্ধকারে দৌড়ে ফিরবার সময় আমাদের বেশ ভয় করছিল। বার বার ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের গল্প মনে পড়ছিল। 'বলাসুরের হাড়। খুঁজে খুঁজে লোকে পাগল হয়ে যায়।' মনে পড়তেই খুব জোরে দৌড়াতে লাগলাম আমরা। ছেলেমানুষ পেয়ে চিত্তদা আমাদের মিছিমিছি একটা বাজে কথা বলে এত কষ্ট দিলেন। আর বিশ্বাস করছি না চিত্তদাকে। ধরণী পণ্ডিত মশাই সত্যি খাঁটি লোক। যা বলেন, ঠিকই বলেন। তাই তিনি এত গম্ভীর।

পরদিন স্কুলে গিয়েই আমরা একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। একদল পুলিশ এসেছে। চিত্তদাকে কোমরে দড়ি বেঁধে দু'জন পুলিশ আগ্‌লে রেখেছে। দারোগা বাবু নতুন কুঁয়োর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কুলিরা কুঁয়োর তোলা মাটি আর পাথরের ঢিবিগুলি খুঁড়ছে। তল্লাসী হচ্ছে।

আমরা দলবেঁধে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটাকে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ ঠুং করে একটা শব্দ হলো। কুলিরা আর পুলিশেরা চেঁচিয়ে উঠলো—পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। সেই ভীড়ের ফাঁকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমরা দেখলাম, দারোগা বাবু একটা চক্‌চকে জিনিস হাতে তুলে নিলেন। একটা কুলি আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখ বড় বড় করে বলে গেল—পিস্তল! পিস্তল!

চিত্তদাকে নিয়ে দারোগা বাবু আর পুলিশেরা চলে গেল। ঘণ্টা বাজলো। ক্লাস বসলো। ধরণী পণ্ডিত মশাই তেমনি শান্ত আর গম্ভীর হয়ে পড়িয়ে গেলেন। আবার ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিত

চলে গেলেন। এবার হেড মাষ্টার মশাই ক্লাসে ঢুকলেন। আজ আর চিত্তদা নেই।

আমরা ভাবছিলাম চিত্তদার কথা। কাল রাত্রে আমাদের ব্যর্থ রত্ন শিকারের কথাও আর মনে ছিল না। চিত্তদার ওপর সব রাগ ভুলে গেলাম আমরা।

সেদিন সন্ধ্যে বেলা, খেলা শেষ হয়ে গেলেও স্কুলের মাঠে আমরা চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। মন্টি পকেট থেকে নীল কাঁচের টর্চ বের করে হঠাৎ সুর করে বললো—মাটি কাটি লভি কোহিনুর। আবার রত্ন শিকার করবো আজ।

আবার আমাদের রত্ন-অভিযান আরম্ভ হলো। সন্ধ্যের অন্ধকারে নতুন কুঁয়োর তোলা মাটি আর পাথরের ওপর নীল কাঁচের টর্চের আলো ফেলে, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলাম। আজ আমাদের কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছিল, চিত্তদার কথা মিথ্যে নয়। আর একটু ভাল করে খুঁজলেই হয়তো একটা সবুজ নুড়ির আলো ফিক্ করে হেসে উঠবে এইখানে। কিম্বা ঠুং করে একটা শব্দ হবে, অথবা চক্‌চক্ করে উঠবে মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা···।

একটা কালো ছায়ার মূর্ত্তি আচম্‌কা আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে কর্কশ স্বরে বললো—এখানে কি করছো তোমরা ?

ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের গলার স্বর প্রথমে বুঝতে পারিনি। তাই চম্‌কে অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—রত্ন-শিকার খেলা করছি, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত আরও কর্কশ স্বরে বললেন—কি বললে ?

—আল্‌ট্রা-ভায়লেট ল্যাম্পের খেলা, পণ্ডিত মশাই।

হঠাৎ ধরণী পণ্ডিতের কর্কশ স্বর দুর্ব্বল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন—রত্ন-শিকার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত—তা, এখানে কেন ?

আমরা কোন উত্তর দিলাম না। ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের গলার স্বর যেন কাঁদ কাঁদ হয়ে কেঁপে উঠলো—এত জায়গা থাকতে এখানে কেন খুঁজতে এসেছ তোমরা ? কে বললে তোমাদের এখানে রত্ন পাওয়া যায় ? সত্যি করে বল, এখানে কেন এসেছ ? আমি জানতে চাই।

আমরাই বেশী আশ্চর্য্য হলাম। এত গম্ভীর ধরণী পণ্ডিত, কেন এত ছট্‌ফট্‌ করছেন ? একটু চুপ করে থেকেই আবার হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন ধরণী পণ্ডিত—আমি তোমাদের বার বার বলেছি, রত্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। ওসব একটা কথার কথা। কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। বলাসুরের হাড়ের গল্প বললাম, তবু তোমাদের বিশ্বাস হলো না ? কি খুঁজতে এসেছ এখানে ? কি খুঁজতে ?

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম—পিস্তল খুজতে, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত চেঁচিয়ে উঠলেন—পিস্তল ? পিস্তলও কি একটা রত্ন হয়ে গেল ? ভুল ভুল ভুল·····।

ধরণী পণ্ডিত মশাই যেন একটা যন্ত্রনার মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলেন। তাঁর ছায়ামূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলে গেল।

এর তিনদিন পরেই ৫ই আষাঢ়ের একটা সন্ধ্যায় আমরা ধরণী পণ্ডিত মশাইকে একেবারে শেষ বিদায় দিয়ে এলাম পাকুড় তলার শ্মশানে। আত্মহত্যা করেছিলেন ধরণী পণ্ডিত। গঙ্গাস্তোত্র গাইবার জন্য হেড মাষ্টার মশাই আমাদের সবাইকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্মশানের সিঁড়িতে বসে সনাতনের বাবা হেড মাষ্টারের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমরা সবই শুনতে পেলাম, ধরণী পণ্ডিত মশাই পুলিশে খবর দিয়ে চিত্তদাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যে হতেই চিতাটা পুড়ে পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে এল। জল ছিটিয়ে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ শেষ করে আমরা চলে আসছিলাম। মন্টি হঠাৎ পকেট থেকে নীল কাঁচের টর্চটা বের করলো।

নিভন্ত চিতার ওপর টর্চের নীল আলো ছড়িয়ে পড়তেই ছোট ছোট লাল জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি স্নিগ্ধ সবুজ আলোকের টুক্‌রোর মত শোভাময় হয়ে উঠলো। বলাসুরের টুক্‌রো টুক্‌রো হাড় সত্যিই রত্ন হয়ে গেছে। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

১লা আষাঢ়, ১৩৫১

বিলি
বন্দিনীর
দুঃখের
কথা কি?
পড়লের
চিঠি

কাঁকুলিয়া। পয়লা শ্রাবণ। স্নেহের পুতুল।

তুমি আবার জিজ্ঞেসা করেছ, গল্পগুলি কি সবই সত্যি? বুঝতে পারছি, তোমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে। তোমার ইচ্ছা, গল্পের দুঃখগুলি সব মিথ্যে হয়ে যাক্, আর মজাগুলি সব যেন সত্য হয়! তা ছাড়া, তুমি গল্পের অনেক ভুল ধরেছ। তুমি লিখেছ—"বাংলা স্কুলের ছেলেরা কেন আরও এক ঘণ্টা আগে স্কুল থেকে পালিয়ে গয়া রোডের কাছে চলে যায়নি? তাহ'লেই তো সবাই গান্ধীজীকে দেখতে পেত।" তুমি লিখেছ—"ধরণী পণ্ডিত মশাই আর চিত্তদার সঙ্গে আর একবার ভাব হয়ে গেলেই তো বেশ হতো। ভাব হলো না কেন?"

কিন্তু এসব আমার গল্পের ভুল নয়, পুতুল। এসব লোকের জীবনের ভুল। সত্যি সত্যি বাংলা স্কুলের ছেলেরা বুদ্ধি করে এক ঘণ্টা আগে স্কুল থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি। সত্যি সত্যি চিত্তদা আর ধরণী পণ্ডিতের মধ্যে কিছুতেই আর ভাব হয়নি। আমি কি করবো বল?

এখন শ্রাবণ মাস। আকাশ ছাপিয়ে বর্ষা নেমেছে। আজ কিসের গল্প বলি? বাঘ টাঘ? ভূত টুত? তুমি বলবে, হ্যাঁ বাঘ টাঘের গল্পই আজ বেশ জম্‌বে। বেশ মজা লাগবে। হাজারিবাগের সন্ধ্যে বেলায় বাইরে ঝর্‌ঝর্ করে বৃষ্টি পড়বে। দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বালিয়ে বিছানার ওপর বসে সবাই মিলে বাঘের গল্প পড়তে খুব ভাল লাগবে। গল্পের বাঘ দূর জঙ্গলের ভেতর ভীষণ গর্জ্জন করবে, ভীতু হরিণের ঘাড় মট্‌কাবে। ঘরের ভেতর বিছানার ওপর বসে মিথ্যে ভয় ভয় করবে। বেশ মজা লাগবে না?

বেশ, বাঘের গল্পই বলবো। কিন্তু আমার বাঘ যদি হালুম হালুম

না করে, যদি ভীতু হরিণের ঘাড় না মট্‌কায়, তবে আমাকে দোষ দিও না। কিন্তু আমি গল্পে ফাঁকি দেব না। কেননা, ফাঁকির গল্প আমি জানি না।

আমারও এখন বাঘ টাঘের কথা মনে পড়ছিল। এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় বড় মেঘের টুক্‌রোগুলিকে দেখে আমার তাই মনে হয়। মেঘগুলি আকাশের কিনারা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। কোনটার চেহারা সিংহের মত, কোনটা হাতীর মত, কোনটা বাঘের মত। এক একটা মেঘের দলকে দেখাচ্ছে যেন একটা শিং-ওয়ালা নীল গাইয়ের দল, স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। মনে হয়, আকাশে কোথাও একটা চিড়িয়াখানার ফটক ভেঙে গেছে। দলে দলে জন্তু জানোয়ার ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা বাঘ তারাই শুধু মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে গর্জ্জন করে। তার পরেই বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ঝর্‌ঝর্‌ করে!

তবে শোন—বিলির জীবন কাহিনী।

কে এই বিলি?

এই বিলিই আমার গল্পের বাঘ। জাতে সোনাচিতা। দেশ চাত্‌রার জঙ্গল।

বিলির জীবনীর প্রথম অধ্যায় শোন। চাত্‌রা থেকে মোটর বাসে হাজারিবাগ আসছিলাম। খুব ভোরে এক নদীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য মোটর বাস থামলো। এখানে সড়কের দু'পাশে মাঠের মত বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই জঙ্গল। আমরা মোটর বাসে বসেই দেখছিলাম, একটু দূরে মাঠের ওপর এক মহুয়ার গাছের নীচে ছোট্ট একটি জীব খেলা করছে। মোটর বাসের খালাসীটা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার পরেই দৌড়ে গিয়ে মহুয়া তলা থেকে ছোট্ট জীবটাকে কোলে তুলে নিয়ে ফিরে এল! আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—একটা সোনাচিতার বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চা। বাঘিনী মা নিশ্চয় কাছে কোথাও আছে এখুনি ফিরে আসবে। তারপর ?

না, আমরা আর এক মূহূর্ত্ত দেরী করিনি। তখুনি মোটর বাস ছেড়ে দিল। কিছুদূর যাবার পর বাসের জানালা দিয়ে একবার পিছন ফিরে মহুয়া তলার দিকে তাকালাম। মনে হ'ল, মহুয়া তলায় সাদা কুয়াসার মধ্যে যেন একটা ছায়াময় দুরন্ত জন্তুর মূর্ত্তি হুটোপুটি করছে, মাটি শুঁকে শুঁকে কিছু খুঁজছে। আমাদের মোটর বাস আরও জোরে দৌড়তে আরম্ভ করলো।

খালাসীর কাছ থেকে সোনা চিতার বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ডাক্‌লাম—বিলি! হঠাৎ নামটা মুখে এসে গেল।

খুব সপ্রতিভ হয়ে শান্তভাবে আমার কোলের উপর বসেছিল বিলি। ড্রাইভার হর্ণ বাজাচ্ছিল, ষ্টিয়ারিং ঘোরাছিল। বিলি চুপ চাপ বসে স্থিরদৃষ্টি তুলে সব কাণ্ড কারখানা দেখছিল। দেখলাম বিলির গা'টা তখনো শিশিরে ভিজে রয়েছে। রুমাল দিয়ে মুছে দিলাম। আরামে মাথাটা কাৎ করে শুয়ে রইল বিলি। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নতুন দেশের জীব হয়ে গেল বিলি। দেখে মনে হচ্ছিল, বিলি যেন কতদিন ধরে এই মোটর বাসে নিয়মিত যাওয়া আসা করছে। এখন মহুয়া-তলায় কুয়াসার ভেতর যে বাঘিনী মায়ের স্বপ্ন ছট্‌ফট্‌ করছে, বিলির সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। জঙ্গলের ঘনছায়া আর একটা পাথুরে গুহার অন্ধকারের স্নেহ থেকে বিলির প্রাণ যেন একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। কলের গাড়ীর ওপর চড়ে বিলি তখন আমাদের সঙ্গে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে সহরের দিকে। জঙ্গলের সীমা শেষ হতে চলেছে।

আমাদের মোটর বাস্‌ কোম্পানীর অফিসে দই আর হলুদ-জলে সেদ্ধ মাংস খেয়ে বড় হতে লাগলো বিলি। এক বছরের মধ্যে দেখতে

দেখতে বড় হয়ে উঠলো। ছোট্ট খাট্ট এক পালোয়ানের মত দেখাতো বিলিকে। বক্সিং গ্লাভ্‌সের মত চওড়া থাবা, আঁটসাঁট শরীরে চক্‌চকে চামড়ার আড়ালে মাংসের পেশীগুলি গোল গোল বলের মত যেন নাচানাচি করতো। গায়ের উপর কালো-হলুদে মেশানো ছোপগুলি দেখে মনে হতো বিলিকে যেন এক খেলোয়াড়ের ইউনিফর্ম পরিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা খুঁটোর সঙ্গে লম্বা শেকল দিয়ে বাঁধা থাকতো বিলি। সারাদিন ঘুমিয়ে আর লাফ ঝাঁপ করে বিলির সময় কেটে যেত। সারা রাত বিলি ঘুমোত না। মনের সুখে চীৎকার আর লাফালাফি করতো। লাফালাফি করার জন্য যেন একটা নেশা ছিল বিলির। এক দমে, একটানা, ক্লান্তিহীন ও ক্ষান্তিহীন ভাবে বিলি অকারণে লাফাতো, থাবা ঘস্‌তো, পাঁয়তাড়া করতো। বিলির খেলার হরেক রকম কায়দা দেখে আমরা অবাক্ হয়ে যেতাম্। বিলির জীবন শৈশবেই তো তার জঙ্গল মুছে গেছে। তবে এত জংলী পাঁয়তাড়ার দরকার কি? কোথা থেকে এসব কৌশল শিখলো বিলি? শিকার মেরে খাবার কোন প্রয়োজন কখনো হয়নি বিলির, ভবিষ্যতেও হবার কোন কারণ নেই। তবু বিলি এত চেষ্টা করে সেই হিংস্র জীবিকার কৌশল মক্স করে কেন?

গয়লা যখন দুধ দোয়, বিলি গরুটার দিকে একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে থাবা লুকিয়ে কুঁকড়ে বসে পড়ে। আস্তে আস্তে লেজ নাড়ে। তার পরেই প্রচণ্ড একটা লাফ দেয়। কিন্তু শেকলে বাঁধা বিলির আক্রমণ শূন্যে ব্যর্থ হয়ে মিলিয়ে যায়।

দূরে পথ দিয়ে ঘোড়াগাড়ী যায়, দু'চারটে খেঁকি কুকুর পথ ভুলে বাগানের দিকে বেড়াতে আসে। বিলি চোরের মত নিঃশব্দে ঘোড়া আর কুকুরগুলোর দিকে জ্বলন্ত লক্ষ্য রেখে থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে। ঘোড়া আর কুকুরেরা চলে যায়। বিলি কিছুক্ষণ উদাস

হয়ে বসে থাকে। তারপরেই অস্থির ভাবে লাফাতে থাকে বিলি। শুধু লম্বা শেকলটা আছাড় খেয়ে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজতে থাকে।

বিলির মতিগতি দেখে আমার সন্দেহ হতো — বাঘ কি কখনো পোষ মানে ? ওর রক্তের ভেতর জঙ্গল রয়েছে। একদিন না একদিন···।

কিন্তু কে বলবে পোষ মানেনি বিলি ? যখন বড় বেশী দুরন্তপনা করতো বিলি, তখন সত্যিই একটু বিরক্ত বোধ করতাম। তা ছাড়া কুকুর আর ঘোড়া দেখলেই বিলির ঐ সব হিংসুটে চালিয়াতি দেখলেই আমার বড় রাগ হতো, তখনি উঠে গিয়ে জোরে হাঁক দিয়ে ডাকতাম — বিলি ! কানের ওপর জোরে একটা গাঁট্টা মারতাম। বিলি তখুনি মাটীর ওপর একেবারে চার পা তুলে চিৎ হয়ে ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটা কাতর শব্দ করতো। দেখে মনে হতো, যেন তার অপরাধ বুঝতে পেরেছে বিলি। তাই মাপ চাইছে।

আমি ছিলাম বিলির শাসক। বিলি আমার বাধ্য ছিল। বিলি আমাকে ভয় পেত। কিন্তু আর একজন ছিল, যার কাছে বিলি আদরে ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেত। এক নেপালী বুড়ো, তার নাম পোহাল সিং, সেই মোটর কোম্পানীর অফিসের দারোয়ান। নেপালী বুড়ো পোহাল সিংয়ের কাছে বিলির কোন শাসন ছিল না। শুধু আদর আর আদর। কে যে কাকে বেশী আদর করতো বোঝা যেত না।

বিলি যখন খেয়ে দেয়ে টান হয়ে শুয়ে ঘুমোত, পোহাল সিং পাশে বসে বিলির গায়ে হাত বুলিয়ে দিত। লক্ষ্য করতাম, পোহাল সিংয়ের ছোট ছোট চোখের মোটা ভুরু দুটো আনন্দে কুঁচকে উঠছে। বিলির মোটা গর্দ্দানটাকে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে চুলকিয়ে দিত

পোহাল সিং। তারপর যেন নিজের মনের আহ্লাদেই গদগদ হয়ে বলে উঠতো — আহা! পশু হায়, পশু হায়!

জেগে উঠতো বিলি। এইবার বিলির পালা। নেপালী বুড়োর ঘাড়ের উপর থাবা রেখে টান হয়ে বিলি দাঁড়াতো। বুড়োর মাথার টুপিটা কামড় দিয়ে মাটীতে নামাতো। খিল খিল করে ছোট্ট ছেলের মত হেসে উঠতো নেপালী বুড়ো পোহাল সিং। বিলি তখুনি আর এক দফা আক্রমণ করতো, নেপালী বুড়োর গরম কোটের আস্তিনটাকে কামড়ে ধরতো। একটী ঝাঁকুনি দিয়ে ফর্ ফর্ করে ছিঁড়ে ফেলতো। পোহাল সিং তবু হি-হি করে হেসে শুধু মজা দেখতো আর বলতো — আহা! পশু হায়! পশু হায়।

পোহাল সিংয়ের জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলা বিলির যেন প্রতি-দিনের খেলা ছিল। পোহাল সিংয়ের বউ রোজই জামার আস্তিন সেলাই করতো। এই ব্যাপার নিয়ে বুড়ো বুড়ীতে রোজই একটা ঝগড়া হতো। কিন্তু পোহাল সিং গ্রাহ্য করতো না। জামার আস্তিন রোজই সেলাই হতো, রোজই বিলি একবার করে ছিঁড়ে ফেলতো।

বিলিকে শাসন করার সময় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখতাম, পোহাল সিং আছে কি না। একদিন দেখলাম, একটা ভিখারী ছেলের দিকে তাকিয়ে বিলি আবার থাবা ঘসছে আর গোঁপ চাটছে। ভয়ানক রাগ হলো। মানুষের সংসারে থেকেও মানুষ চিনতে শিখলো না জানোয়ারটা! উঠে গিয়ে বিলির কানের ওপর জোরে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলাম। বিলি তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে মাটীর ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে ক্ষমা চাইতে লাগলো। পর মুহূর্ত্তেই দেখলাম, বারান্দায় থামের আড়াল থেকে এক জোড়া জ্বলন্ত নেপালী চোখ তাকিয়ে আছে। সমস্ত ঘটনাকে দেখছে। তাড়াতাড়ি সরে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই পোহাল সিং এসে সামনে দাঁড়ালো। দেখলাম,

রাগ চাপতে গিয়ে পোহাল সিংয়ের মুখটা লাল হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আম্‌তা আম্‌তা করে পোহাল সিং বললো — বাবু, বিলিকে আপনি মিছামিছি মারেন। এটা উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম — কেন ?

পোহাল সিং উত্তর দিল — পশু হ্যায় ! ওকে মেরে কি লাভ হবে ?

পোহাল সিংয়ের মুখে ঐ এক কথা — পশু হ্যায় ! পশু হ্যায় ! এর মানে কি ? কিন্তু বলতে চায় নেপালী বুড়ো ? পশু হ্যায়, অর্থাৎ ওর সাত খুন মাপ। ওকে শুধু দই মাংস খাওয়াতে হবে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হবে। পোহাল সিং চায় বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়ে উঠুক। কিন্তু তা কি করে হয় ? তবে জঙ্গল থেকে বিলিকে নিয়ে এলাম কেন ? আমরা বাঘের বাচ্চাকে পোষ মানাতে চাই, মানুষ করতে চাই।

একটা ঘটনায় বিলির ওপর বড় খুসী হয়ে উঠলাম। বিশ্বাস হলো, বিলি সত্যিই মানুষ হয়ে উঠবে। সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

বিলেত থেকে করিন্থিয়ান ফুটবল খেলোয়ড়ের দল ভারতবর্ষে ম্যাচ খেলতে এল সেই বছর। আমাদের সহরেও একটা ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। খেলার মাঠে এত লোকের ভীড় কোনদিন হয়নি। লাট সাহেবও এসেছিলেন। খেলা আরম্ভের আগে করিন্থিয়ান দল আর ভারতীয় দলের ফটো তোলা হলো। ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারার করিন্থিয়ানেরা সার বেঁধে দাঁড়ালো। করিন্থিয়ান দলে ক্যাপ্টেন সগর্ব্বে একটা সিংহকে কোলে নিয়ে দাঁড়ালো।

তুমি বোধ হয় শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ পুতুল। সিংহ কোথা থেকে এল ? কিন্তু সত্যিকারের সিংহ নয়। ফ্লানেলের কাপড় দিয়ে তৈরী একটা লিক্‌পিকে সিংহ। দেখেই ঘেন্না হয়। কিন্তু

ঘেন্না হলে হবে কি, ঐ ফ্লানেলের সিংহ কোলে নিয়েই করিন্থিয়ানেরা সগর্ব্বে দাঁড়িয়েছিল।

এখন আমরা কি করি? ভারতীয় দল কি শুধু এই সসিংহ সাহেব খেলোয়াড়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে? তা হয় না। আমাদের বিলি, পোহাল সিংহের প্রিয় পশু আমাদের হাতের কাছেই আছে! একেবারে জলজ্যান্ত জোয়ান সোনা চিতা।

বিলিকে তখুনি ময়দানে আনা হলো। আমাদের ভয় হলো, অবাধ্য দুরন্ত বিলি ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেনের কোলে চড়বে কি না। হয়তো হুটোপুটি করে আর একটা হাস্যকর তছনছ্ কাণ্ড করে বসবে।

বিলির গলার শেকল খুলে দিলাম। ভারতীয় দলের সামনে এগিয়ে দিলাম! ক্যাপ্টেন সামাদ বিলিকে কোলে তুলে নিল।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বিলি একটুও দুষ্টুমি করলো না। ক্যাপ্টেন সামাদের কোলে উঠে শান্ত হয়ে বসে রইল বিলি। মোটা গর্দ্দান উঁচিয়ে একবার করিন্থিয়ানদের লিক্‌পিকে সিংহটার দিকে দৃপ্তভাবে তাকালো। সমস্ত গ্যালারিতে হাততালির শব্দ বাজতে লাগলো।

বাঃ রে বিলি বাঃ! সেই দিন প্রথম সত্যি করে আদর করলাম বিলিকে। এত নির্ব্বোধ দুরন্ত বিলি, কিন্তু আমাদের সম্মানের সমস্যাটা বুঝতে একটুও দেরী হয়নি বিলির।

মাত্র দু'দিন পরেই এই বিশ্বাস নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিল বিলি। জংলী হিংসুক বুনো বিলি।

একটা ছোট ছেলে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিলিকে দেখছিল। হঠাৎ বিলি একটা লাফ দিয়ে উঠে ছেলেটাকে থাবা মেরে মাটীতে ফেলে দিল। তারপরেই ছেলেটার ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন দৌড়ে এসে ছেলেটীকে উদ্ধার করে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তেমন সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। ছেলেটীর ঘাড়ের ওপর বিলির দাঁত বসে গিয়ে একটু জখম হয়েছিল।

বাস্, আর নয়। বাঘের বাচ্চা বাঘই হবে। বাঘের বাচ্চা কখনো মানুষ হতে পারে না। বুঝলাম, দই মাংস খাইয়ে একটী মানুষের শত্রুকে আমরা বড় করে তুলেছি।

জনমতের আদালতে বিলির বিচার হয়ে গেল। সবাই একমত হলো — এই হিংস্র জীবকে এখুনি বিদায় করে দেওয়া উচিত। তথাস্তু। কিন্তু কি ভাবে বিদায় করা হবে ? জেল না নির্ব্বাসন ?

করিন্থিয়ানদের সঙ্গে ম্যাচের দিনে বিলি যে মস্ত বড় একটা মানুষী কীর্ত্তির সার্টিফিকেট পেয়েছিল, তারই জোরে জেল থেকে বেঁচে গেল বিলি। সবাই বললেন — চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল·····।

তার চেয়ে ভাল কি ? নির্ব্বাসন ? তা হলে কি কোন মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে বিলিকে ছেড়ে দিয়ে আসবো ?

না, তা'ও নয়। সবাই বললেন—ঐ পশুকে বনেই ছেড়ে দেওয়া হোক্।

তাই ঠিক হলো। কিন্তু আমার মনে একটা রাগ রয়ে গেল। এ তো ঠিক শাস্তি হলো না। এ যে বিলির মুক্তি। সেই মহুয়াতলার কুয়াসা, ঘনবনের ছায়া আর পাথুরে গুহার অন্ধকার আবার ফিরে পাবে বিলি। বেশ, তাই হোক্।

বিলিকে গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে আমরা রওনা হবার বন্দোবস্ত করছি, নেপালী বুড়ো পোহাল সিং গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালো। ছটফট্ করে গাড়ীর চারদিকে ঘুরতে লাগলো—পশু হ্যায় ! পশু হ্যায় ! পোহাল সিং শুধু ব্যর্থ আক্রোশে গজ্ গজ্ করতে লাগলো।

জায়গাটার নাম কুসুম্ভা। ঘন জঙ্গল। জ্যোৎস্না রাত্রি। বিলির গলার শেকলটা আমি শক্ত করে ধরে আছি। আমার সঙ্গে আরও

দুটি বন্ধু আছেন বন্দুক নিয়ে। জঙ্গলের একটু গভীরে নিয়ে বিলির শেকল খুলে দেব। বিলিকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। জঙ্গলের জ্যোৎস্না আর গন্ধের নেশায় বিলি যেন ফূর্ত্তিতে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে চাইছে। বিলি যেন আমাকেই হেঁচড়ে নিয়ে চলেছিল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা বুনো বটের ছায়ার অন্ধকারে আমরা দাঁড়ালাম। এইখান থেকে জঙ্গলটা আরও ঘন হয়ে একেবারে হিংস্র হয়ে গেছে। এইখানে বিলিকে এইবার ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

জ্যোৎস্না রাত্রের জঙ্গলে আরেক রকমের ভয় আছে। একটা নিঃশব্দ আলোছায়ার ষড়যন্ত্র। অতি প্রাচীন পৃথিবীর হিংসাগুলি দল বেঁধে লুকিয়ে আছে প্রতিটি পাতার আড়ালে। সামান্য একটু হাওয়া লাগলেই যেন ফিস্ ফিস্, দূর্ দূর্, মর্ মর্, খা খা, যা যা শব্দ করতে থাকে। চোখে বিভ্রম লাগে। পথ ভুল হয়ে যায়। দিক ঠাহর হয় না।

বিলির শেকল খুলে দিলাম। একটা লাফ দিয়ে বিলি শুক্‌নো পাতার স্তূপের ওপর গিয়ে পড়লো। তারপরেই ঘাড় তুলে সামনের আলোছায়ায় ঠাসাঠাসি বনের রহস্যের দিকে যেন বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল। পর মূহূর্ত্তে আর একটা লাফে একেবারে আমাদের পাশে চলে এল বিলি। পা ঘেঁসে সুবাধ্য পোষা জীবের মত শান্ত হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, বিলি নড়ে না। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম দূরে শুক্‌নো পাতার ওপর। বিলি শুধু শব্দটা শুনলো, কিন্তু এক পা নড়লো না।

কি হলো বিলির? বিলির দিকে ভাল করে তাকালাম। শুনতে পেলাম, বিলি আস্তে আস্তে কুঁই কুঁই করে বেড়ালের মত শব্দ করছে। বিলি ভয় পেয়েছে। বিলিকে নিয়ে শহরে ফিরে গেলাম।

নিজের মুক্তিকে নিজেই মিথ্যে করে দিল বিলি। অগত্যা চিড়িয়াখানাতেই যেতে হবে।

কলকাতার চিড়িয়াখানাতেই বিলির জন্য বাসা ঠিক করা হলো। কিন্তু বার বার মনে একটা খটকা লাগছিল আমার। জঙ্গল দেখে ভয় পেল কেন বিলি ? জঙ্গলকে ভয় পাবে, অথচ মানুষের মাঝখানে জংলীপনা করবে, এ কোন্ ধরণের প্রাণী ?

বিলির খাঁচা তৈরি করা হচ্ছিল। আর দুদিন পরেই বিলি রওনা হবে। এই দুদিন পোহাল সিং শুধু তার ছোট ছোট চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সবার দিকে কটমট্ করে তাকিয়ে থাকতো। তারপরেই চীৎকার করতো—পশু হায় ! পশু হায় !

আমরা বুঝতে পারতাম, পোহাল সিং আজকাল আমাদেরই দিকে তাকিয়ে এই কথাটা বলে। বিলির উদ্দেশ্যে বলে না।

বিলি চিঁড়িয়াখানায় চলে গেল।

বিলির জীবন-কাহিনী আর কি শুনতে চাও পুতুল ? বিলি বাঘ হতে পারেনি, মানুষও হতে পারেনি। তাই ওকে আমরা চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিলাম।

বিলির সঙ্গে মাত্র আর একবার দেখা হয়েছিল। মাস খানেক পরে। কলকাতায় এসে চিড়িয়াখানায় বিলিকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা একটা নতুন ঘরের মেজেতে বালির ওপর শুয়ে আছে বিলি।

অনেক ডাকাডাকির পর বিলি একবার গরাদের কাছে এল।

একেবারেই চিনতে পারলো না আমাকে। নাক ফুলিয়ে গরগর্ শব্দ করতে লাগলো। থাবা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগলো। শুধু এই গরাদের বাধা, নইলে তখুনি এক লাফে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তো বিলি। দেখলাম, বিলির কপালের ওপর রোঁয়াগুলি ঘসা

খেয়ে উঠে গিয়েছে। লোহার গরাদে মাথা ঠুকে ঠুকে এই দশা হয়েছে বিলির।

কেন হলো বলতে পার পুতুল? কিসের জন্য? কেন লোহার গরাদে মাথা ঠুকেছে বিলি?

তিনটে উত্তর মনে এসেছে আমার।

এক, বিলির মন কাঁদছে এখানে। নেপালী বুড়ো পোহাল সিংহের জামার আস্তিন ছিঁড়তে না পেরে ওর সব জীবনের আনন্দ মাটি হয়ে গেছে। তাই পালিয়ে যাবার জন্য দিনরাত গরাদে মাথা ঠুকছে বিলি।

দুই কুসুম্‌ভার জঙ্গলে সেই জ্যোৎস্নারাত্রির আস্বাদ আর একবার পেতে চায় বিলি। পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েও পালিয়ে যায়নি, সেই ভুল বুঝতে পেরে আপশোসে মাথা ঠুকছে বিলি। আর একবার সুযোগ খুঁজছে।

তিন, কিম্বা হঠাৎ ঘুমের মধ্যে একটা আব্‌ছা স্বপ্নে আবার এক মহুয়াতলায় কুয়াশা দেখতে পেয়েছে বিলি। এক বাঘিনী-মায়ের খস্‌খসে জিভ তার গায়ের শিশির চেটে মুছে দিচ্ছে। সব ভুলে, সেইখানে আবার ফিরে যেতে চাইছে বিলি।

আজকের গল্প এইখানে শেষ করলাম পুতুল। কোন্ উত্তরটা সত্যি মনে হয় চিঠিতে জানাবে। বাঘের গল্পটাও মানুষের গল্পের মত হয়ে গেল, তার জন্য আমায় দোষ দিও না।

১লা শ্রাবণ, ১৩৫১

এতদিন
পেটখারাপে ভুগেছি পেশা!
INSECT
B.AMB
MALLYGUNJ
SAMAR
গুরুদেবের
চিঠি

কাঁকুলিয়া। পয়লা কার্ত্তিক। স্নেহের পুতুল ঃ

অনেকদিন আগে আমি একবার লাটসাহেব হয়েছিলাম·····।

এই চিঠিটা পেয়ে, প্রথম লাইনটা পড়েই তুমি নিশ্চয় হেসে ফেলবে। মনে মনে বল্‌বে—মেজকাকুটা আবার যা-তা লিখতে আরম্ভ করেছে। বার বার বলেছি যে মিথ্যে গল্প শুনতে চাই না, তবু কেন যে·····।

কিন্তু বিশ্বাস কর পুতুল, সত্যিই আমি একদিন লাটসাহেব হয়েছিলাম। এখন এখানে কাঁকুলিয়ার বাতাসে গাছপালায় আর পাখির ডাকে একটু একটু শীতের আমেজ লেগেছে। ভোর বেলার নতুন রোদ বেশ মিষ্টি হয়ে উঠছে। এখন তোমায় চিঠি লিখছি। এই সময় কি মিথ্যে গল্পটল্প মনে আসে? আজকের হেমন্তের চোরা শীতের মত ধূর্ত্ত একটা কাহিনী মনের ভেতর সিরসির্ করে উঠছে। সেই কাহিনী শোন।

এর নাম ঠগীকাহিনী। ভাবছো, তোমাকে ঠকাবার জন্য এই কাহিনীটা তৈরী করে করেছি? না, তা নয়। কাহিনীটা খুবই সত্যি, সত্যিই আমি লাটসাহেব হয়েছিলাম।

ঠগীদের কাহিনী কি আগে কখনো শোননি? ভারতবর্ষের ইতিহাসের বই পড়লেই জানতে পারবে যে, উত্তর ভারতে ঠগী নামে একটা খুনী মানুষের দল ছিল। পথেঘাটে এরা ভাল মানুষের মত ঘুরে বেড়াতো। ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, বরযাত্রী বা গেরস্থ, যে কোন পথিকের সঙ্গে পথের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে মেলামেশা করতো। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে—।

কি করতো জান? মেরে ফেলতো। আগে মেরে ফেলে, তারপর পথিকের টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়তো।

ঠগীদের চেহারা দেখে কিন্তু কারও চেনবার উপায় ছিল না যে, মানুষটা কে? ছুরি ছোরা তলোয়ার দূরে থাক্, এক গাছি লাঠিও এরা হাতে রাখতো না। শুধু কাঁধে একখানি গাম্ছা ঝুল্তো। কপালে একটা তিলক।

কিন্তু ঐ নিরীহ তুচ্ছ গাম্ছাটী যে কত হিংস্র হতে পারে, ঠগীরা পৃথিবীতে সেই সত্য হাতে হাতে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বেচারা তীর্থযাত্রী হয়তো গাছতলায় রান্না চড়িয়ে আন্মনা হয়ে কি ভাবছে, বন্ধুবেশী ঠগী অমনি আল্গোছে তার পেছনে গিয়ে মাথায় একটা ফাঁস লাগিয়ে ঘাড়টা উল্টো দিকে মুচড়ে নামিয়ে দিল।

এইরকম ছিল ঠগীদের খুন করার আর্ট। এরা ভবানী বা দেবী মাতার পূজো করতো। হিন্দু মুসলমান সব জাতেরই ঠগী ছিল। এদের একটা গুপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষা ও ইসারা ছিল, সেই জন্য একজন ঠগী অনায়াসে আর একজন অচেনা ঠগীকে চিনে নিতে পারতো। কাক যেমন কাকের মাংস খায় না, এক ঠগী তেমনি কখনো অন্য ঠগীকে মারতো না। অনেক বড় বড় জমিদার ও পণ্ডিত লোকেও ঠগী ছিল। ঠগীগিরি একটা ব্যবসা ছিল মাত্র। উঃ, কী ভয়ানক ব্যবসা!

ঠগীদের মধ্যে একটা রীতি ছিল, যে-মানুষকে তারা খুন করতো তার লাস তুলে নিয়ে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে বড় একটা গর্ত্তে ফেলে দিত। ঠগীরা নিজের নিজের এলাকায় এই সব গর্ত্ত নিজেরাই তৈরী করে রাখতো।

ঠগী গড়্হা অর্থাৎ ঠগীদের তৈরী এই ধরণের গুপ্ত কবরের গর্ত্ত খোঁজ করলে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের হাজারিবাগ সহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা ঠগী গড়্হা আছে। অনেক দিন আগে সেই ঠগী গড়্হা আমি একবার দেখতে গিয়েছিলাম। আজকের মতই হেমন্তের একটী সকাল বেলায় মোটর বাসে চড়ে জায়গাটার কাছে পৌঁছলাম।

জায়গাটার নাম রবার্টগঞ্জ। নামটা শুনে বড় আশ্চর্য্য লাগ্‌লো। ঠগী গড়্‌হার জায়গায় রবার্টগঞ্জ! সেদিনে আর আজকের দিনে কত তফাৎ! সেই ঠগীর দল সাবাড় হয়ে গেছে অনেকদিন। সব ঠগী গড়্‌হার চিহ্নও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখানেও দেখলাম, গড়্‌হাটা প্রায় বুজে গিয়ে ভরাট হয়ে এসেছে। শুধু রবার্টগঞ্জের চেহারাটাই বড় হয়ে চোখে পড়ে। কাছেই একটা ডাক বাংলা। আর একটু দূরে একটা গির্জ্জার চূড়া। কে জানে কতদিন আগে এক রবার্ট সাহেব এসে এখানে একটা গালার কুঠি খুলেছিলেন। তাই এর নাম রবার্টগঞ্জ। কিন্তু শুধু নামে নয়, সমস্ত জায়গাটাই কেমন যেন সাহেব সাহেব হয়ে গিয়েছে।

সড়ক থেকে মাঠে নেমে খানিক দূর এসেই ঠগী গড়্‌হা দেখতে পেলাম। সেইখানে মাঠের ঘাসের ওপর বসে মুগ্ধ হয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখছিলাম। অনেক দূরে ছোট পাহাড়ের ঢালুতে একটা গাঁয়ের চেহারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঢং ঢং ঢং, গির্জ্জার ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। উঁচু নীচু মাঠটা আকাশের কোল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। কোথাও এক টুক্‌রো শালবন, কোথাও বা ঘেসো ফুলে ছাওয়া। আবার কোথাও বা কাঁকুরে মাটির লাল প্রলেপ। সড়কের দু'পাশে সাদা সাদা লম্বা ইউকালিপ্‌টাস্‌ দু'সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট সাহেবের ভাঙ্গা কুঠির স্তূপের ওপর একটা পপলার গাছ চুপ চাপ যেন গলা উঁচু করে চারদিকের নিঃশব্দতাকে পাহারা দিয়ে আগ্‌লে রেখেছে। ডাক বাংলার গড়নটাও বিলেতের কোন গেঁয়ো সরাইয়ের মত। লাল টালির চালার ওপর সবুজ আল্‌পনার মত আইভি লতাগুলি এঁকে বেঁকে ছড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে আছি, দুটী গাঁয়ের মেয়ে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে কি-একটা জিনিষ বেচবার জন্য এগিয়ে এসে বললো — ফরাঁস বিনি আছে, নেবেন বাবু?

ফরাঁস বিনি অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ বীন। রবার্টগঞ্জের পাহাড়ী ক্ষেতে এই

ফরাঁস বিনি ফলেছে। ষ্টেশনের বাজারে বিক্রি করার জন্য চাষী মেয়ে দুটি চলেছে। দু'জন লোক কাঁধে কুড়ুল নিয়ে কাঠ কাটতে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজনের নাম আর্থার আর একজনের নাম ইম্যানুয়েল। বাঃ খাসা ইংরিজী নাম। ওরা সবাই খৃষ্টান।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ছিল। কতগুলি ছন্নছাড়া মেঘের টুক্‌রো আকাশে ভেসে চলেছিল। মেঘের ছায়াগুলি মাঠের ওপর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছিল। বাতাসও একটু জোরে বইতে সুরু করে দিল। একদল নেংটিপরা কালো কালো ছোট ছেলে ডাক বাংলার সামনে চোরধরা খেলছিল। বসে বসে শুনছিলাম, ছেলেরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছড়া গেয়ে চোর গুনছে, কে চোর হবে?

"হু হান্‌ড্রেড টেরিটারি এসি বেসি বয়
টিপ্‌ টাপ্‌ গাম্‌লা সাফ্‌"

ছড়ার ভাষাটাও যে ইংরিজী হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য্য! আর কি বাকী রইলো?

না, সত্যিই ঠগী গড়্‌হা ভরাট হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। ঠগী গড়্‌হার দিকে তাকিয়ে সমস্ত মনটা যেন দেড়শো বছর আগেকার একটা পুরানো পাপকে নিঃশব্দে ঠাট্টা করে উঠলো—কই, আজ কোথায় তোমার সেই ভণ্ড ধূর্ত্ত নিষ্ঠুর গামছার গর্ব্ব? ভেবেছিলে, চিরদিন নিরীহ পথিকের লাস গিলে গিলে···।

বেশ নিশ্চিন্ত মনে, যেন ক্লান্ত হয়ে বসেছিলাম। আকাশের মেঘের ছায়াটা আরও ঘন হয়ে উঠছিল। ছোট ছেলেরা কখন খেলা সেরে চলে গেছে জানি না। একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে চোখ বুঁজে নিঝুম হয়ে বসেছিলাম।

হঠাৎ চম্‌কে উঠে চোখ খুলে তাকালাম, কে যেন বেশ জোরে জোরে কাশছে।

তাকানো মাত্র বুকের ভেতর যেন দম ফুরিয়ে গেল! হঠাৎ একটা আতঙ্কে আমার হাত-পায়ের গাঁটগুলিও ঢিলে হয়ে ভেতরে ভেতরে খুলে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার বুদ্ধিও হলো না, ক্ষমতাও বোধ হয় ছিল না। একটা লোক, ভয়ানক চিম্‌ড়ে চেহারা, মাথার চুলগুলি সাদা, চোখ দুটো জবার কুঁড়ির মত লাল আর ভেজা ভেজা। ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা বেশ বুড়ো হয়েছে, মুখের রং খুব ফর্সা, নাকের রং সিমেন্টের মত। ঠিক নাকের ডগার ওপর একটা কালো আঁচিল, যেন একটা ডাগর ভীমরুল কামড় দিয়ে বসে রয়েছে।

লোকটা পলকহীন চোখে আমাকে দেখতে দেখতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটার গায়ে কোন জামা নেই। মোটা মোটা রগ আর জির্‌জিরে হাড়ের তৈরী বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে হাঁপাচ্ছে! একটা নোংরা ছেঁড়া পায়জামা, দু'হাঁটুর কাছে দু'টো বড় ফুটো, ভেতর থেকে হাঁটুর চাকতি দুটো উঁকি দিচ্ছে। দেখলাম্‌, কাঁধে একটা গামছা ঝুল্‌ছে।

সর্ব্বনাশ! সেই গামছা! না, আর দেরী করা উচিত নয়। তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে একটা সেলাম জানালো। ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে ঘেয়ো গলার স্বরে বললো — হুজুর।

জিজ্ঞাসা করলাম — কে তুমি?

— আমি আপনার খিদ্‌মত্‌গার হুজুর, আপনার সেবার জন্য যা করতে হবে হুকুম করুন। আমি এই ডাকবাংলোর খান্‌সামা।

— কি নাম তোমার?

— ভঁদু ওস্তাদ।

— তা আমার কাছে কি দরকার?

— আমার কোন দরকার নেই হুজুর। আপনার দরকারের জন্যই আমি এসেছি।

তখনো ভঁদু ওস্তাদের কাঁধে গামছাটা ঝুলছে। আমার মনের ভেতর সন্দেহটাও দুল্‌ছে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল — সত্যি করে বল, তুমি সত্যিই ভঁদু ওস্তাদ তো? না, দেড়শো বছর আগেকার সেই ভয়ানক গাম্‌ছা বাহিনীর একটী বিশিষ্ট নেতা?

ভঁদু ওস্তাদ গদ্‌গদ্‌ ভাবে বললো — আপনার লানচ্‌ রেডি আছে হুজুর। শুধু একবার কষ্ট করে চলে আসুন।

— লানচ্‌ কি?

ভাত খাবার ভঙ্গীতে মুখে হাত দিয়ে ভঁদু আমাকে বুঝিয়ে বললো — লানচ্‌ লানচ্‌।

বুঝলাম, লানচ্‌ অর্থাৎ লাঞ্চ অর্থাৎ সাহেবী খানা।

ভয় ভেঙে গেল, ক্ষিদেও পেয়েছিল। ভঁদু ওস্তাদকে এতক্ষণে চিনতে পারলাম। নিজের ভুল বুঝে মনে মনে হাসলাম।

একটু পরেই খুব ব্যস্ত হয়ে এসে ভঁদু ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করলো — একটা দশ টাকার নোটের বদলে চেঞ্জ দিতে পারেন হুজুর?

আমি বললাম — না।

ভঁদু ওস্তাদ — তাহ'লে একটা পাঁচ টাকার নোটের চেঞ্জ দিন।

আমি বললাম — না, তা'ও নেই।

ভঁদু ওস্তাদ বিমর্ষ ভাবে বললো — একটু চেষ্টা করে দেখুন না হুজুর, নিশ্চয় হবে।

আমার ভয়ানক রাগ হলো। পকেটের ভেতর টাকা পয়সা যা ছিল সবই বের করে নিয়ে ভঁদু ওস্তাদকে দেখিয়ে বললাম — এই তো যা আছে, এ'তে পাঁচ টাকার চেঞ্জ হয় না। বার বার বলছি, তবু কেন তুমি·····।

ভঁদু ওস্তাদ হাত যোড় ক'রে বললো —মাপ করবেন হুজুর। আমার নাতিরা পুতুল কিন্‌বে ব'লে বায়না ধরেছে, তাই অন্ততঃ চারটে টাকা ওদের হাতে দেব ভেবেছিলাম। আমার সব সুদ্ধ চারটী

নাতি-নাতনী হুজুর, প্রত্যেককে অন্ততঃ একটী ক'রে টাকা না দিলে আমার মান থাকে না। যাক্, অগত্যা দশ টাকার নোটটাই ওদের দিয়ে দেব।

ডাক-বাংলোর বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম, দরজা জানালাগুলি ঘন মাকড়সার জালে ছেয়ে আছে। অন্ততঃ দশ বছরের মধ্যে কোন অতিথি নিশ্চয় এখানে আসেনি। ভঁতু ওস্তাদ বললো—অনেক দিন পরে আপনার মত এক সাহেবের সেবা করার সুযোগ পেলাম।

নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে ভঁতু ওস্তাদ হঠাৎ সগর্ব্বে বলে উঠলো—কত কাপ্তেন কার্ণাইল আর নিস্পিটার জেনারেলকে পাঁচ মিনিটে লানচ্ তৈরী করে খাইয়েছে এই ভঁতু ওস্তাদ। স্বয়ং লাটসাহেব এই বারান্দায় ঠিক এইখানে বসে আমার মুর্গীর রোষ্ট খেয়ে গেছেন।

ঘরের ভেতর থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল ভঁতু ওস্তাদ। গামছা দিয়ে চেয়ারের ধুলো ঘসে ঘসে মুছলো। চেয়ারের একটা পায়া ভাঙ্গা ঠ্যাং-এর মত বেঁকে ছিল। পাঁচ মিনিট ধরে ঠোকাঠুকি করে, একটা দড়ি দিয়ে পায়াটাকে শক্ত করে বেঁধে, ভঁতু ওস্তাদ চেয়ারটাকে আমার দিকে এগিয়ে দিল—বসুন হুজুর। এই চেয়ারেই লাট সাহেব বসেছিলেন।

সেই চেয়ারের ওপর আমি আস্তে আস্তে খুব সাবধানে বসলাম। লাট সাহেব হতে আরম্ভ করলাম।

ভঁতু ওস্তাদ আবার বললো—একটু অপেক্ষা করুন হুজুর। লাট সাহেবকে যেসব খাবার খাইয়েছিলাম, ঠিক সেই সব খাবার আজ আপনাকে খাওয়াব।

আমার পকেটে মাত্র তিন টাকা দু'আনা পয়সা ছিল। ভঁতু

ওস্তাদের কথা শুনে তাই একটু ঘাব্‌ড়ে গেলাম। বললাম—না হে খানসামা সামান্য একটু ডাল ভাত তরকারী হলেই হবে!

ভঁদু ওস্তাদ মাথা নেড়ে বললো—তা হয় না। অনেক দিন পরে আপনার মত সাহেবকে পেয়েছি, আজ মনের সুখে রান্না করে খাওয়াবো, ঠিক লাটসাহেবকে একদিন যেসব খাবার খাইয়েছিলাম।

ভঁদু ওস্তাদ কিছুক্ষণ চুপ করে বিশ্রীভাবে আমার দিকে তাকিয়ে কি জানি কি ভাবতে লাগলো। তারপর পেছন ফিরে বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডাক্‌লো—পালোয়ান, পালোয়ান!

ভঁদু ওস্তাদের ডাক শুনে একটা লোক হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এসে বারান্দায় আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ষণ্ডামার্কা চেহারার একটা লোক, হাত দুটো কাদামাখা, বোধ হয় ক্ষেতে কাজ করছিল। লোকটার ভুরু দুটো একজোড়া শুঁয়োপোকার মত, খোঁচা খোঁচা রোঁয়ায় ভরা। তাকালেই মনের ভেতরটা যেন কট্‌ কট্‌ করে জ্বলতে আর চুল্‌কোতে থাকে।

ভঁদু ওস্তাদ বললো—আমি যাই, আপনার লানচ্‌ তৈরী করি। পালোয়ান রইল আপনার কাছে।

একটু বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম --- কেন?

ভঁদু ওস্তাদ উত্তর দিল — আপনাকে টেন্‌সন্‌ করার জন্য।

টেন্‌সন্‌! কী ভয়ানক দুর্বোধ্য কথা! এ যে সাঙ্কেতিক ভাষা! আবার সন্দেহ জাগ্‌লো, কে এরা, ভঁদু ওস্তাদ আর পালোয়ান?

আবার ভয় পাবার আগেই ভঁদু ওস্তাদ বললো—এই পালোয়ান লাটসাহেবকেও টেন্‌সন্‌ করেছিল।

চিন্তিত ভাবে পালোয়ানের দিকে তাকাতেই, পালোয়ান মিলিটারী কায়দায় পা দুটো জোড়া করে, বুক টান করে, হাত তুলে একটা স্যালুট করলো।

এতক্ষণে বুঝলাম, পালোয়ান আমার সম্বন্ধে অ্যাটেন্‌সন্‌ হয়ে

থাকবে। কখন কি দরকার হয়, বলা তো যায় না। ভঁদু ওস্তাদের ব্যবস্থা ভালই।

ভঁদু ওস্তাদ লানচ্ তৈরী করতে চলে গেল। একটু পরেই চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোথা থেকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। বড় রোগা ও শুক্‌নো শুক্‌নো চেহারার ছেলেমেয়ে। ইসারা করে তাদের কাছে ডাকলাম ও জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ওরা ভঁদু ওস্তাদের নাতিনাতনি। বড় লাজুক ও ভীতু ছেলেমেয়েগুলি।

ভঁদু ওস্তাদের সব চেয়ে ছোট্ট নাতিটারই একটু দুষ্টু গোছের চেহারা। ছেলেটার পেটে আস্তে একটা চিম্‌টি কেটে জিজ্ঞাসা করলাম —কি সাহেব, আজ কি খেয়েছ ?

ছেলেটা বললো—কুছ্ নেহি।

আবার প্রশ্ন করলাম – কাল কি খেয়েছ ?

ছেলেটা আবার বল্‌লো—কুছ্ নেহি।

সঙ্গে সঙ্গে ভঁদু ওস্তাদের ছোট নাতনিটী বলে ফেললে—না বাবু, ও মিথ্যে কথা বলছে। কাল আমরা ইয়া বড় একটা পেঁপে খেয়েছি।

জিজ্ঞেসা করলাম—শুধু পেঁপে খেলে কেন ?

ভঁদু ওস্তাদের নাত্‌নি বললো—বাড়ীতে চাল নেই, আটাও নেই, খাবার জিনিস কিছু নেই।

চারটে পয়সা ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে বললাম—যাও, মিঠাই কিনে খেও।

খুসীতে ব্যস্ত হয়ে ছেলেমেয়েগুলি চলে গেল। বুড়ো ভঁদু ওস্তাদের সংসারটা কত গরীব, তাই যেন স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। বেচারা ভঁদু ওস্তাদ! পায়জামার হাঁটু দুটো পর্য্যন্ত ফুটো হয়ে গেছে। বড় দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য্যও লাগছিল, এত

দশ টাকার আর পাঁচ টাকার লম্বা লম্বা মিথ্যেকথাগুলি কেন বলছিল ভঁতু ওস্তাদ ?

তখুনি চোখে পড়লো, দূরে বারান্দার এক কোণে নিঃশব্দে বসে পালোয়ান আমার ওপর নজর রাখছে। টেন্‌সন্‌ করছে। উঃ, কী বিশ্রী রকমের দৃষ্টি ! আবার একসঙ্গে রাগ ও ভয় হতে লাগ্‌লো। একটু ছট্‌ফট্‌ করে উঠলাম। চেয়ারটার ভাঙা পায়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো। আরও ভয় পেয়ে এক লাফে বারান্দা থেকে নেমে সামনের বাগানের ঝাউগাছটার তলায় ঘাসের ওপর গিয়ে বসে রইলাম। পালোয়ানও সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে একটা লাফ দিয়ে বাগানে নামলো। একটু দূরে একটা আতা গাছের তলায় গিয়ে বসলো। তারপর সেই খোঁচা খোঁচা ভুরুর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে টেন্‌সন্‌ করতে লাগলো।

নাঃ, আর উদ্ধারের আশা নেই। আবার সন্দেহ হচ্ছে। এখনো সরে পড়ার কি কোন উপায় নেই ?

অনেকক্ষণ এই চিন্তার মধ্যেই অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। হঠাৎ পায়ের শব্দে চম্‌কে দেখলাম, ভঁতু ওস্তাদ একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে উদ্বিগ্ন ভাব আর ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই আশ্বস্ত হয়ে একেবারে একগাল হেসে বললো —এখানে বসে আছেন হুজুর ! বসুন বসুন, কী সুন্দর হাওয়া ! চেয়ার ছেড়ে লাটসাহেবও ঠিক এইখানে উঠে এসে বসেছিলেন।

একটু আশ্বস্ত হয়ে ভঁতু ওস্তাদ চলে গেল। তার একটু পরেই এসে বললো—খানা তৈরী হুজুর, আসুন।

আবার উঠে গিয়ে সেই চেয়ারের ওপর শক্ত হয়ে বসলাম। ভঁতু ওস্তাদ গিয়ে ঠেলে ঠেলে একটা নড়বড়ে নোংরা টেবিল নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে দিল। তারপর এল লানচ্‌। কলাই করা লোহার থালায় মোটা লাল চালের ভাত। ভঁতু বললো—রাইস্‌।

একটা হাতলভাঙা পেয়ালায় ঘোলা গঙ্গাজলের মত ডাল নিয়ে এল ভঁদু—এই, আমার হাতের তৈরী স্যুপ, একবার টেষ্ট করে দেখুন হুজুর।

তারপর এল একটা বাটীতে ঢেঁড়সের ঝোল। ভঁদু বললো—এই হলো ষ্টু। কাষ্টার্ড পাউডার ফুরিয়ে গেছে হুজুর, তাই রান্নটা একটু পাতলা হয়ে গেছে। নইলে দেখতেন···।

সব শেষে একটা মাটীর খুরিতে কিছু চট্‌কানো আলুসেদ্ধ নিয়ে এসে ভঁদু টেবিলের ওপর রাখলো—এই নিন হুজুর, এটা হলো ইস্‌মাস্ পোটাটো। অনেক কষ্ট করলাম হুজুর, মেহেরবানী করে একটা সার্টিফিকেট আপনাকে দিতেই হবে হুজুর।

মনের হাসি মনেতেই চেপে রেখে খাওয়া শেষ করলাম। তবু ভাল, খুব সস্তায় সেরেছি।

এইভাবে মাত্র তিনটী ঘণ্টার জন্য আমি লাটসাহেব হয়েছিলাম, পুতুল। খাওয়া শেষ হলো, আর আমার লাটসাহেবীও ফুরিয়ে গেল।

সহরে ফিরবার মোটর বাস্ আসবার সময় হয়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ে ভঁদু ওস্তাদকে বললাম—কই, তোমার কত বিল হয়েছে বল। আমি এইবার উঠবো।

হাত ধুয়ে এসে ভঁদু ওস্তাদ সাম্‌নে দাঁড়ালো। একটা লম্বা সেলাম দিয়ে বললো—বিল আর কত হবে হুজুর, খুব সামান্যই হয়েছে! শুধু আপনি খুসী হয়েছেন জানতে পারলেই আমার মেহন্নত ধন্য হবে।

বললাম—কত দিতে হবে বল? আর দেরী করার সময় নেই আমার।

ভঁদু ওস্তাদ বললো—তিন টাকা এক আনা হুজুর।

মনে মনে চম্‌কে উঠলাম। ঐ যাচ্ছেতাই ডাল ভাত আলুসেদ্ধ আর ঢেঁড়স, তার দাম তিন টাকা এক আনা!

কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য্য, তিন টাকা এক আনা বলে কেন? কি ক'রেই বা বুঝলো যে, আমার পকেটে শুধু তিন টাকা এক আনাই আছে? তিন টাকা দশ আনা হতে পারতো, দু' আনা হতে পারতো, তা নয়, ঠিক গুনে গুনে তিন টাকা এক আনা!

বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেন জানি ভয়ে সির্ সির্ করে উঠলো। কে এরা? পকেটময় সংসারের অন্তর্য্যামী, এরা কে?

দেখলাম, ভঁদু খানসামার কাঁধের গাম্‌ছাটা দুল্‌ছে, দূরে দাঁড়িয়ে পালোয়ান তার খোঁচা খোঁচা ভুরুর দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে আমাকে টেন্‌সন্ করছে।

তিন টাকা এক আনা, পকেট থেকে সর্ব্বস্ব বের করে দিয়ে, একরকম হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে দৌড়ে সড়কের ওপর এসে দাঁড়ালাম। মোটর বাসে যদি দয়া করে তুলে না নেয়, তবে হেঁটেই রওনা হতে হবে। অতীতের ঠগী গড়্‌হা প্রায় ভরাট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। দেখে একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আধুনিক রবার্টগঞ্জের নতুন গাম্‌ছা কী সাংঘাতিক! আর এক মূহূর্ত্ত এখানে নয়!

তারপর মোটর বাসের আশায় অনেকক্ষণ সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার ঘাড়ের কাছটা থেকে টন্ টন্ করে উঠছিল।

তোমার কি মনে হয় পুতুল? জিরজিরে হাড়ের তৈরী যার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ করছে, যার নোংরা ছেঁড়া পায়জামার হাঁটুর কাছে দুটো বড় বড় ফুটো, যার নাতি-নাতনী দু'দিন ধরে না খেয়ে রয়েছে, ঐ বুড়ো ভঁদু ওস্তাদ—সে কি সত্যিই ঠগী? কেন সে আমাকে ভাত আর ঢেঁড়সের ঝোল খাইয়ে তিনটি টাকা আর একটী আনা ঠকিয়ে আদায় করে নিল?

১লা কার্ত্তিক, ১৩৫১

পত্রলেখা চিঠি
এত কেন
ভয়ঙ্কর চেহারা
কেন
কেমন যেন
ভয়!

কাঁকুলিয়া। পয়লা অগ্রহায়ণ। স্নেহের পুতুল :

তোমার চিঠি পেলাম। কিছুক্ষণ আগে পাশের বাড়ীর ছাদের ওপর একটা মুখপোড়া হনুমান বেশ ভদ্রভাবে বসেছিল। পাড়ার যত দুষ্টু ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে, চীৎকার করে আর পিচকারী দিয়ে জল ছিটিয়ে হনুমানটাকে ভয়ানক বিরক্ত করেছে। হনুমানটা চলে গেছে। দুষ্টু ছেলেদের হল্লা এখন আর নেই।

তাহলে একটা দুষ্টু ছেলের গল্পই আজ লিখি। কেমন?

আচ্ছা থাক্, দুষ্টু ছেলের গল্প না হয় আর একদিন বলবো। কত লোকেই তো দুষ্ট ছেলেদের নিন্দে করে কত গল্প লিখেছে! কিন্তু দুষ্ট বাবাদের গল্প কেউ লেখে না কেন? পৃথিবীতে কি বাবারা দুষ্টু হয় না? অম্বিকে মাষ্টার পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে দুষ্টু ছেলের বিরুদ্ধে চুগলি করেছেন—

"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলি দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এত বড় বাঁদর।"

শুনলে তো পুতুল, অম্বিকে মাষ্টার কী ভয়ানক খারাপ খারাপ কথা বলেছে দুষ্টু ছেলের নামে? কিন্তু তা'তে কোন ফল হয় হয়নি। রবীন্দ্রনাথ অম্বিকে মাষ্টারের কথা একেবারে গ্রাহ্য করেননি; বরং তিনি বলেছেন—শিশুপাঠে লেখা ঐ কবিতাগুলো দুষ্টু ছেলে পড়বে কেন? দুষ্টু ছেলেদের নিজেদের যদি একটি কবি থাকতো, তার লেখা নিশ্চয় পড়তো ওরা।

বুড়ো কবিরা যা লেখে, তার মধ্যে দুষ্টু ছেলের হাসি-কান্নার কথা নেই। তাই আমারও বলতে ইচ্ছে করে, হে অম্বিকে মাষ্টারের দল, দুষ্টু ছেলেকে কখনো বকুনি দিওনা বরং যারা ভাল ছেলে, তাদের বকে দিয়ো।

লব কুশ দু'ভাই দুষ্টু ছিল। বনের ভেতর অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটক করে বেঁধে রেখেছিল। লক্ষণকে হারিয়ে দিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু বাবা রামচন্দ্রই বা কি কম দুষ্টু ছিলেন? তিনিই তো সীতাকে বনে পাঠিয়েছিলেন। সব দুঃখ সহ্য করে দুষ্টু দু'ভাই বনের মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে যদি লব-কুশের সমবয়সী কোন ছোট্ট বাল্মীকি থাকতো, তবে রামচন্দ্রের এই অপরাধে কখনো সে ক্ষমা করতো না। রামচন্দ্র কত হাজার রাক্ষস মেরেছেন, সে-গল্প হাজার হাজার শ্লোক দিয়ে কখনোই লিখতো না সে। রামায়ণের নামটাই হয়তো সে বদলে দিয়ে লিখতো ছোট্ট একটি ছড়ার বই—"এক দুষ্টু বাবার কাহিনী।"

পুরাণে ও মহাকাব্যে অনেক মহৎ ছোটছেলের গল্প আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, সেগুলি সবই দুষ্টু বাবাদের গল্প। বুড়ো কবিরা অবশ্য খুব ঘটা করে এই সব মহৎ ছোটছেলের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু খুব ঘটা করে দুষ্টু বাবাদের নিন্দে করেন নি। শুধু প্রহ্লাদ আর ধ্রুবের বাবা সামান্য একটু গালমন্দ খেয়েছেন কবিদের হাতে। হিরণ্যকশিপু আর উত্তানপাদ—কী ভয়ানক দুটী দুষ্টু বাপ! কোন দুষ্টু ছেলে আজ পর্য্যন্ত এত ভয়ানক হতে পারেনি। তবু পৃথিবীতে শুধু দুষ্টুছেলেদেরই নিন্দে বেশী।

বাবাদের নিন্দে করছি না, পুতুল। কত বাবা ছেলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু ছোট ছেলেরাও বাবার জন্য প্রাণ দিয়েছে। এই রকমের দুটী ছোট ছেলের পিতৃভক্তির কথা আমার সব সময় মনে

পড়ে—কর্ণের ছেলে বৃষকেতু, আর ক্যাসাবিয়াঙ্কা। ছোট ছেলেরা শুধুই যে দুষ্টু হয়, তা নয়। শুধু যে তারা বাবার চশমা ভাঙে, তা নয়। ছোট ছেলেরা মহৎও হয়।

কিন্তু এ সবই পুরনো গল্প। পুরনো গল্প তুমি শুনতে চাও না, আমিও পুরনো গল্প বলবো না। আমি আজ যার গল্প বলবো, সেই ছোট ছেলেটীর নাম গবু।

বৃষকেতু, ক্যাসাবিয়াঙ্কা আর গবু। এই তিনজনের মধ্যে আমি কাকে সব চেয়ে বড় বলবো, বল দেখি পুতুল ?

এদের মধ্যে পিতৃভক্তির গুণে সব চেয়ে বড় হলো গবু। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আচ্ছা, আগে গবুর গল্পটা শুনে নাও, তারপর আমায় জানাবে যে গবুর মত পিতৃভক্ত কোন ছোট ছেলের গল্প কখনো শুনেছ কি না।

ছেলেবেলায় গবু আমাদের সঙ্গে পড়তো। দুষ্টুমির জন্যই সে বিখ্যাত ছিল। যত অম্বিকে মাষ্টারের দল সব সময় গবুর নিন্দে করতো। আমাদের সাবধান করে দিত—গবুর সঙ্গে মিশবে না কেউ।

আমি, কানু, হীরু, ভুতো, বলাই, সবাই অবশ্য কাকা বাবা আর মাষ্টারদের সামনে কান ধরে প্রতিজ্ঞা করতাম—না, গবুর সঙ্গে কখ্খনো মিশবো না।

এখন ভাবতে হাসি পায়। কাকা বাবা আর মাষ্টারেরা শুধু বড় বড় বুড়ো কবির লেখা মহাকাব্যের তত্ত্বটুকু বুঝেছেন। আমাদের করুণ মুখের ধূর্ত্ত কাব্যের ছলনাকে এক বর্ণও বুঝতে পারেননি তাঁরা। আমাদের প্রতিজ্ঞাটাকে একেবারেই চিনতে পারতেন না। স্কুলের বাইরে আসা মাত্র এবং ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র আমরা গবুর সঙ্গেই মিশতাম।

গবুর বাবা ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। গবুর মা ছিল না, অন্য

ভাইবোন কেউ ছিল না। ঐ অদ্ভুত মানুষটাই ছিল গবুর একমাত্র আপন জন।

গবুর বাবা সহর থেকে দূরে একটা পিঁজরাপোলে ম্যানেজারের কাজ করতেন। সব সময় গাঁজা খেতেন। গবুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখারও বোধ হর অবসর পেতেন না। স্কুলে আসতো গবু শুধু একটা শ্লেট বগলে নিয়ে। বই খাতা কিছুই ছিল না। স্কুলের মাইনে, পরীক্ষার ফী, কিছুই দিত না গবু। শুধু স্কুলে আসতো, ডাকগাড়ীর মত একেবারে নিয়মমত, কোনদিন কামাই হতো না। মাষ্টারেরা বারণ ক'রে ক'রে হায়রান হয়ে গেছেন, তবু স্কুলে আসতো গবু, কোন বারণ শুনতো না।

গবুর গায়ের জামাটা নোংরা হয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একেবারে ন্যাকড়া হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ একদিন একটা নতুন কোট দেখতাম গবুর গায়ে। পরে শুনতে পেতাম, কানুর মা দয়া করে দিয়েছেন।

ঘোর বাদ্‌লার দিনেও সকাল ন'টার মধ্যে সহরে চলে আসতো গবু। শ্লেট বগলে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতো যতক্ষণ না স্কুলে যাবার সময় হয়। কোন দিন আমাদের পাড়ায় আসতো, কোন দিন হীরুদের পাড়ায়, আবার এক-একদিন বলাইদের পাড়ায়।

হয়তো সকাল বেলা ঘরের ভেতর তখনো পড়ছি। বাড়ীর বাইরে রাস্তার ওপর একটা ভাসা-ভাসা ডাক শুনতে পেতাম—ডেহ্‌রি—অন্‌—শোন্‌!

এটা আমাদের বাংলা স্কুলের দলের একটা সাঙ্কেতিক ভাষা। কারও বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে অসময়ে নাম ধরে ডাকবার উপায় ছিল না। কারণ অসময়ে কাউকে ডাকলেই তার' কাকা বাবা বা মাষ্টার তখুনি তেড়ে আসবেন, বাইরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাই এক একদিন হঠাৎ শুনতে পেতাম, বাইরে থেকে গবুর আহ্বান ভেসে আসছে—ডেহ্‌রি-অন্‌-শোন্‌·····।

অর্থাৎ, একবার শুধু শুনে যা, বাইরে আয়, সামান্য একটা কথা আছে, খুব গুরুতর কিছু নয়, কোথাও যেতে হবে না।

পড়া ছেড়ে দিয়ে চট্ করে একবার বাইরে আসতাম।—কি রে গবু ?

—কিচ্ছু না, কি করছিস ?

—পড়ছি।

—আচ্ছা যা।

ঘরে ফিরে এসে পড়া শেষ করলাম। মাত্র সাড়ে ন'টা বেজেছে। কাকার সাইকেলটাকে নিয়ে উঠোনের মধ্যে একটু শ্লো-রেস প্র্যাকটিস্ করছি। আবার বাইরে গবুর ডাক শোনা গেল—গোলক ধাম ! গোলোক ধাম !

অর্থাৎ একটা কাজের কথা আছে। অত্যন্ত জরুরী কথা, এখুনি না শুন্‌লে নয়।

ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলাম, গবু রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।—কি খবর রে গবু

—স্কুলে যাবার সময় কাগজে মুড়ে খানিকটা নুণ নিয়ে যাবি, বুঝলি ? ভুলিস্ না।

—আচ্ছা।

ঘরে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলাম। দশটা বেজেছে, খেতে বসবো এখুনি। আবার বাইরে ডাক শোনা গেল—বহু ব্রীহি ! বহু ব্রীহি !

অর্থাৎ বহু বিপদ, বহু কাজ। এক মুহূর্ত দেরী করলে চলবে না। এক্ষুনি বাইরে চলে এস, হয়তো অনেক দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। হয়তো মিশন স্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুলের কাছে, একটা মারামারি হবে, এক্ষুনি তৈরী হতে হবে।

দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। গবু বললো—তোর খাওয়া হয়ে গেছে ?

না।

—আচ্ছা, তুই খেয়ে নে, আমি ততক্ষণ দাঁড়াচ্ছি। আজ আমার আর খাওয়া হলো না। আর সময়ও নেই।

রাগ হলো গবুর ওপর। এই সামান্য একটা কথা বলবার জন্য বহুব্রীহি দেবার কোন দরকার ছিল না। মিছামিছি কী ভয়ানক চম্‌কে উঠেছিলাম!

কিন্তু ঘরে ফিরেই মা'র কছে গিয়ে চুপি চুপি বলতাম—মা, গবুর এখনও খাওয়া হয়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মা আশ্চর্য হয়ে বলতেন—ডেকে নিয়ে আয় গবুকে। ভাত খেয়ে যাক্।

এই ভাবে ডাক দিয়ে দিয়েই জীবন চলছিল গবুর। সেজন্য গবুর এতটুকু দুঃখ ছিল না। কী তেজই ছিল ওর রোগা হাড়ে! এক টাট্টু ঘোড়ার চাট্ খেয়ে গবুর হাঁটুটা ফুলে উঠলো একদিন। তার পর ক'টা দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলো গবু। তারপর যে-কে-সেই।

গাঁজা খেয়ে খেয়েই গবুর বাবার চাকরীটা গেল। গবুর বাবা দস্তুর মত ভিক্ষে করতে আরম্ভ করলেন। সবার কাছেই হাত পাততেন গবুর বাবা।—শুধু ছেলেটার জন্যই ভাবছি স্যর। মাতৃহারা ছেলে। শুধু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার ছাড়তে পারি না। নইলে সন্ন্যাসী হয়ে যেতাম, স্যর। কিন্তু এই মাতৃহারা ছেলেকে মানুষ করতে হবে স্যর। তাই প্রার্থনা, একটা টাকা যদি দয়া করে দিতেন তবে·····।

যত সব মিথ্যে কথা। তবুও প্রথম প্রথম সবাই সত্যি দয়া করে টাকাটা দিয়ে দিতেন! গবুর বাবাও গাঁজা খেয়ে টাকাটার সদ্ব্যবহার করতেন। কিন্তু গবুর বাবার চালাকী বেশী দিন চলেনি। কেউ আর গবুর বাবাকে বিশ্বাস করতেন না। কেউ তাঁকে আর সাহায্য করতেন না।

মাঝে মাঝে গবুর কাছেই গবুর বাবার নামে আমরা নিন্দে করতাম—তোর বাবা খুব গাঁজা খায় না রে গবু ?

গবু বলতো—মিথ্যে কথা।

আমরা হেসে ফেলতাম, গবুর ওপর রাগও হতো। কী পিতৃভক্ত ছেলে !

গবুর মিথ্য কথা শুন্‌তে আমাদের খুব আশ্চর্য লাগতো। ভূতো জিজ্ঞাসা করতো—তোর বাবা কি কাজ করে রে গবু ? চাকরী করে না কেন ? তোকে জামা কাপড় কিনে দেয় না, স্কুলের মাইনে দেয় না, পড়ার বই দেয় না, কেন রে গবু ?

গবু বলতো—বাবার একটুও সময় নেই, এত কাজ। সমস্ত দিন ম্যানেজারী করতে হয়, কত জায়গা যেতে হয়। সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে হয়, রাজাদের সঙ্গে দেখা করতে হয়·····।

মিথ্যে কথা বলতে বলতে শেষ দিকে একটুখানি সত্য কথা বলে ফেলেছে গবু। হ্যাঁ, গবুর বাবা তখন সত্যিই রোজ এক রাজার সঙ্গে দেখা করতেন। এই রাজাটি সহরে নতুন এসেছেন নিজের রোগের চিকিৎসার জন্য। খুব খারাপ একটা রোগ, পেটের ভিতরে বিষ-ঘা না কি-একটা হয়েছে। সব ডাক্তার কবরেজ হাকিম জবাব দিয়ে দিয়েছেন—এ রোগ সারবার নয়। রাজাসাহেবের আয়ু আর বেশী দিন নয়।

রাজাসাহেবের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী এসে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। আমরা শুনতে পেলাম, ঐ সন্ন্যাসী রাজাসাহেবকে সারিয়ে তুলবেন মন্ত্রের জোরে।

গবুর বাবা রোজই যেতেন রাজসাহেবের বাড়ী। বারান্দার সিঁড়িতে বসে থাকতেন। যতক্ষণ না অন্ততঃ একটা সিকি বা আধুলি ভিক্ষে পেতেন, ততক্ষণ নড়তেন না। কি আর করবেন গবুর বাবা ? এ ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। সহরে সবাই গবুর বাবাকে

ভাল করে চেনেন, গেঁজেলকে কেউ সাহায্য করতে চান না। এখন তাঁর একমাত্র ভরসা এই রাজাসাহেবের বাড়ী।

কদিন পরেই আমরা ভয়ানক একটা খবর পেলাম। আমাদের স্কুলের মালী শিবু একটা খবর দিল। —ঐ বেটা রাজসাহেব চলে না গেলে এ-সহরে ভয়ানক একটা অমঙ্গল হবে।

—কেন শিবু?

—রাজসাহেবের ঐ সন্ন্যাসীটাই হলো সব চেয়ে ভয়ানক জীব।

—কেন?

—বেতালসিদ্ধ সন্ন্যাসী।

—তাতে কি হয়েছে?

—অনেক টাকা দিয়ে একটা মানুষ কিনতে চাইছেন রাজাসাহেব। ঐ সন্ন্যাসী মন্ত্রের জোরে রাজার রোগ চালান করে দেবেন অন্য এক জনের শরীরে। তাই মানুষ খুঁজছেন রাজসাহেব।

চোখ দুটো আতঙ্কে বড় বড় ক'রে শিবু শেষে আপশোষ করলো—দেখা যাক্, কার কপালে কি আছে? খুব সাবধানে থাক্‌বে খোকারা, খুব সাবধান!

হ্যাঁ, খুব সাবধানে থাকা উচিত। কেন জানি না আমাদের সবারই চট্ করে মনে পড়ে গেল গবুর কথা। সব চেয়ে আগে গবুরই সাবধান হওয়া উচিত।

গবুকে আমরা সবাই মিলে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বললাম—বিশ্বাস নেই রে গবু। তোর বাবা রোজ রাজাসাহেবের বাড়ী যাচ্ছেন, টাকা নিয়ে আসেন। শেষকালে সন্ন্যাসীটা তোর ওপরেই···।

আমরা ভয়ে-ভয়ে, কেঁপে-কেঁপে, ফিস্-ফিস্ করে এত বড় একটা বিপদের কথা বললাম, সব কথা চুপ করে শুনলো গবু। তার পরেই একটা কাঁচা তেঁতুল পকেট থেকে বের করে চুষতে আরম্ভ করলো, একটুও ভয় পেল না, একটা কথা বললো না।

রাগ করেই আম্‌রা গবুকে বললাম—তোরই কপালে বিপদ আছে, জেনে রাখিস্‌!

গবুর জন্য তোমারও নিশ্চয় খুব দুঃখ হচ্ছে, না পুতুল? হ্যাঁ, দুঃখ হবারই কথা। বৃষকেতুর গল্প পড়ে আমারও একদিন এই রকম দুঃখ হয়েছিল। কী ভয়ানক গল্প! শ্রীকৃষ্ণ একদিন এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন—ব্রাহ্মণের ক্ষুধা শান্তি কর। যা-তা খাবার হলে চলবে না। তারপরে, বৃষকেতুর দিকে তাকিয়ে সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বললেন—এই ছোট ছেলেটির কচি মাংস খাব।

কর্ণ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বৃষকেতু নিজেই তার বাবাকে ভরসা দিল—অতিথি সেবা কর বাবা, ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ো না। আমাকে মেরে আমার মাংস খেতে দাও ব্রাহ্মণকে।

পিতৃভক্ত বৃষকেতু! বাপের ধর্ম্মের জন্য নিজেকে খুসী মনে বলি দিতে রাজী হলো। কিন্তু বাবা হয়েও কী বোকা এই কর্ণ? মানুষ-খেকো ব্রাহ্মণটার নাকে একটা ঘুসি মারতে পারলো না। ছোটছেলে বৃষকেতুকে কাটতে গেল নিজের ধর্ম্মের জন্য? ছি ছি! থাকতো যদি একটি ছোট্ট বেদব্যাস, একটি ছোট মহাভারত নিশ্চয় সে লিখে ফেলতো। তাহ'লে বুঝতো ঠেলা মহাবীর কর্ণ।

ক্যাসাবিয়াঙ্কার কথাও মনে পড়ছে। বাবা বলে গেছেন, যতক্ষণ তিনি না ফেরেন, ততক্ষণ যেন ক্যাসাবিয়াঙ্কা কোথাও না যায়। জাহাজে আগুন লাগলো। ক্যাসাবিয়াঙ্কা তবু এক পা নড়ে না, বাবা যে বারণ করে গেছেন। সেইখানে দাঁড়িয়ে পুড়ে মরে গেল ছোট ছেলে ক্যাসাবিয়াঙ্কা।

ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে একটু বোকা-বোকা ছেলে মনে হয় না কি পুতুল? আমার তো তাই মনে হয়। ক্যাসাবিয়াঙ্কার বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে না মরে যদি দূরে সরে গিয়ে সে বাঁচতো, তবে তার বাবা নিশ্চয় দুঃখিত হতেন না। তবু তাকে পিতৃভক্ত বলতে

পারি। শুধু বাবার একটা কথা রাখতে গিয়ে নিজেকে বলি দিল। কিন্তু ক্যাসাবিয়াঙ্কার বাবাটাই বা কি কম বোকা? বুড়ো হয়েও স্পষ্ট করে কথা বলতে জানেন না। কথাগুলি একটু ভেবেচিন্তে বলা উচিত ছিল তাঁর।

আর আমাদের গবু? তিন চারদিন ধরে গবুর কোন খোঁজ না পেয়ে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। সেদিন রবিবার ছিল। গবু নেই, গুলি-ডান্‌ডা তেমন ক'রে জমে উঠছিল না। গবুকে খুঁজতে বের হলাম আমরা।

আমি, হীরু, কানু, ভুতো, বলাই, ঘুরতে ঘুরতে রাজাসাহেবের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছলাম।

রাজাসাহেবের বাড়ীর ফটকটা বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেতরের কোন লোককে দেখা যায় না।

বলাই বললো — আমি দেখছি।

একটা গাছে চড়ে একবার রাজাসাহেবের বাড়ীর বারান্দার দিকে তাকালো বলাই। তারপরেই যেন ভয় পেয়ে সর্ সর্ করে নেমে এসে বললো — গবু বসে রয়েছে চুপ করে, মুখ চুণ করে। গবুর বাবা দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করছে।

আর কিছু বুঝতে বাকী নেই আমাদের। গবুর বাবা টাকা নিয়ে গবুকে বিক্রী করে দিয়েছেন রাজাসাহেবের কাছে। এইবার সেই ভয়ানক সন্ন্যাসীটা মন্ত্র পড়ে রাজাসাহেবের রোগ চালান করবে গবুর শরীরে। সত্যি সত্যিই গবু এবার রোগে ভুগে ভুগে মরে যাবে।

কটা মিনিট আমরা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্ করলাম, ভুতোর চোখ ছলছল করছিল। কি করে গবুকে বাঁচানো যায়? কি উপায়? একবার যদি বাইরে আসতে পারতো গবুটা, তাহ'লে·····।

ফটকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভুতো একবার টেনে টেনে ছল্‌ছল স্বরেই ডাক দিল — ডেহ্ রি-অন্-শোন·····।

বোধ হয় শুন্‌তে পেয়েছে গবু। কিন্তু বৃথাই আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আমাদের সামান্য একটা কথা শোনার জন্য গবু আর বাইরে এল না।

কানু বললো —ওতে হবে না। আমি ডাকছি।

চেঁচিয়ে জোর গলায় কানু একটা গর্জ্জন ছাড়লো — গোলোক ধাম, গোলোক ধাম·····!

কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধতা। ফটকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এই গবু এল বুঝি! কিন্তু এল না। কী বোকা ছেলে গবু! তবু বোকাটাকে বাঁচাতেই হবে। ফটকের কাছে রাস্তার ওপর দৌড়ে দৌড়ে হীরু চরম বিপদের সঙ্কেত হাঁক দিয়ে শোনাতে লাগলো — বহু ব্রীহি! বহু ব্রীহি! বহু ব্রীহি·····।

এ ডাক নিশ্চয় গবুর কানে পৌঁছেছে। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, বহু বিপদ, ভয়ানক বিপদ, এখুনি বাইরে এস, এখুনি অনেক দূরে পালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমরা শুধু ডেকে ডেকে হাঁপিয়ে পড়লাম পুতুল। গবু বাইরে এল না।

কেন আসবে গবু? ও যে বৃষকেতু আর ক্যাসাবিয়াঙ্কার চেয়ে অনেক বড়। বাপের ধর্ম্মের জন্য নয়, বাপের মুখের কথার জন্য নয়, শুধু বাবার গাঁজার জন্য প্রাণ দিতে তৈরী হয়ে এসেছে গবু।

গবুর হৃদয় বুঝবার মত কোন কবি নেই। গবুর কথা কেউ জানে না। কবিরা মস্ত বড় আর মস্ত বুড়ো। "সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন — থাকতো ওর নিজের জগতের কবি·····।"

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫১।

———

দুঃখের চিঠি
এ এলো কে
এ এলো
এ এলো
এ এলো
এ এলো
কে ?

পয়লা পৌষ। কাঁকুলিয়া। স্নেহের পুতুল।

একটা গল্প বলি শোন। সে অনেকদিন আগের কথা, আমরা তখন খুব ছোট। ছোট আমাদের বাংলা স্কুল, ছোট আমাদের ক্লাসের বেঞ্চ আর ডেস্ক, ছোট আমাদের খেলার মাঠে ছোট একটি ফুটবল! অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছিল। ছ'সাতটা ছোট ছোট খরগোসের তাড়া খেয়ে একদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। তখন সূর্য্য ডুব্‌ছে, দূরে পশ্চিমের শালবনের ভেতর একটা অভ্রখনির মুখ থেকে বয়লারের কালো ধোঁয়া আকাশে উঠে ডুবন্ত রোদের ছোঁয়ায় লাল হয়ে উঠ্‌ছে। আর পূবে, আরও অনেক দূরে, পাহাড়তলীর আবছায়ার মধ্যে একটা গির্জার ঘণ্টা বাজছে — ঢং ঢং ঢং। ঘণ্টার শব্দটা সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজছিল।

মাত্র ছ'সাতটী ছোট ছোট কোমল চেহারার খরগোস একটা নিদারুণ মজবুত চেহারার বাঘকে ধরবার জন্য মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। বাঘের দুরন্ত মূর্তিটাও প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছিল শালবনের দিকে, খোলামেলা মাঠের আলোবাতাস থেকে পালিয়ে গিয়ে বোধ হয় জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়তে। বাঘটা এক একবার পেছু ফিরে তাকায়, তারপর আরও জোরে দৌড়তে থাকে, ঊর্ধ্বশ্বাসে, ভয়ে ভয়ে, লেজ গুটিয়ে···।

না, ঠিক লেজ গুটিয়ে নয়। গল্পটা বলতে গিয়ে প্রথমেই একটু ভুল হলো পুতুল, কিছু মনে করো না! এই গল্পে যে বাঘের কথা বলছি, সত্যি তার লেজ ছিল না। আর ছ'সাতটী যে ছোট ছোট খরগোসের কথা বলছি, তাদেরও সত্যি সত্যি চারটী ক'রে পা আর দুটো ক'রে খাড়া খাড়া কান ছিল না। এই গল্পের বাঘ সত্যি করে বাঘই নয়, আর এই গল্পের খরগোস সত্যি করে খরগোসও নয়।

তবে তারা কি ?

তারা কি, সেই কথাই বলছি।

এখনো তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছো না পুতুল। লেজ নেই এ কেমন বাঘ? চার পা নেই, এ কেমন খরগোস? গল্পটা নিশ্চয় মিথ্যে!

না পুতুল, গল্পটা মিথ্যে নয়। সত্যি সত্যি একদিন মাঠের ওপর দিয়ে খরগোসের মতন ছোট ছোট ছ'সাতটী ছেলে, প্রকাণ্ড বাঘের মত একটা মানুষকে ধরতে তাড়া করেছিল। আর সেই বাঘের মত মানুষটা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেই যে গেল তো গেলই, আর ফিরে এল না। আর তাকে কোনদিন আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে তারই কথা আমার মনে পড়ছে। তার নাম বাসুদেব।

কুস্তিগীর বাসুদেব, বাড়ী গোরখপুর জেলায়, লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, বুকের বেড় আটচল্লিশ ইঞ্চি, গর্দানটা বাঘের ঘাড়ের মত। বাসুদেব যখন দম টেনে শরীর ফুলিয়ে টান হয়ে দাঁড়াতো, তখন তাকে কেমন দেখাতো জান? মহাবলীপুরমে অতি পুরনো যুগের একটা মন্দিরের ভগ্নস্তূপে আজও একটা দ্বারপালের পাথুরে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বাসুদেবকে দেখাতো ঠিক এই রকম পাথুরে প্রহরীর মত। ওর সমস্ত শরীরটাই যেন একটা গায়ের জোরের মূর্তি, কারও সাধ্য নেই যে ওকে ধাক্কা দিয়ে একটুও নড়িয়ে দিতে পারে।

এই বাসুদেবের সঙ্গে কি ক'রে আমাদের পরিচয় হলো, তারপর কি হলো, এবং তারপর আরও কি একটা অদ্ভুত রকমের কাণ্ড হয়ে গেল, সেই গল্পই বলছি।

আমাদের ছোট একটা কুস্তির আখ্‌ড়া ছিল। বাংলা স্কুলের মালী শিবুর ঘরের পেছনে ছোট একটা ঝিঙে ক্ষেতের পাশে, ছোট একটা একচালার নীচে আমরা আখড়া তৈরী করেছিলাম। আমাদের ছোট

আখ্‌ড়া, একজোড়া ছোট ছোট মুগুর ছিল। আর ছিল শিবুমালীর দেওয়া একজোড়া পুরনো খড়ম, বুক ডন দেবার জন্য। দেড় পয়সা দামের একটা মাটীর ধূপদানও ছিল আমাদের। গন্ধমাদনধারী শ্রীহনুমানজীর একটা চারপয়সা দামের ছোট ছবিও রেখেছিলাম আখ্‌ড়াতে, কুস্তির আগে হনুমানের ছবিটাকে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে আমরা পূজো করতাম।

আমাদের কুস্তির আখ্‌ড়ার বর্ণনা শুনে তোমার বোধ হয় হাসি পাচ্ছে পুতুল। কিন্তু জান না তো, আমাদের আখ্‌ড়া আর মুগুর যতই ছোট হোক্ না কেন, আমাদের ওস্তাদেরা কেউ ছোট ছিলেন না। কুস্তির সময় আখ্‌ড়ার একদিকে থাকতেন বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর গামা কাল্লু ও কিক্কড়সিং, আর একদিকে থাকতেন হেকেনস্মিট ও গচ। প্রত্যেক দিন সকাল বেলায় তাল ঠোকার শব্দে পৃথিবীর এই সব বিখ্যাত কুস্তিগীরদের চম্‌কে দিয়ে আমরা বেদম কুস্তি লড়তাম।

কথাটা একটু পরিষ্কার করেই বলি, নইলে তুমি আবার অবিশ্বাস করবে। কথাটা হলো, আমাদের আখ্‌ড়ার একচালাটার খুঁটোতে ঐ সব বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীরদের এক একটা ছবি ঝুল্‌তো। খবরের কাগজ থেকে কেটে ঐ সব ছবি আমরা যোগাড় করেছিলাম। আমাদের তাল ঠোকার শব্দে, আর হুটোপুটির বাতাসে ছবিগুলি সত্যিই এক একবার নড়ে উঠতো। হলোই বা ছবি, আমরা ওঁদের সবাইকে আমাদেরই আখড়ার সদস্য বলে মনে করতাম। তবে নীরব সদস্য, এই যা দুঃখ। নইলে আমাদের ফুর্তিভরা কুস্তি দেখে ওঁরাও নিশ্চয় তারিফ করে উঠতেন — সাবাস্ বাহাদুর!

কাজেই আমাদের আখড়া যতই ছোট হোক্, আমাদের ভরসা আর বিশ্বাস ছোট ছিল না। মোলায়েম ময়দার মত আখড়ার সেই মাটীকে আমরা মাসে একবার করে পাঁচ আনার দই মাখিয়ে আরও অপার্থিব করে তুলতাম। সেই মাটী গায়ে মেখে দশটা বুক-ডন

দিতেই আমাদের নিঃশ্বাস কেমন যেন দুরন্ত হয়ে উঠতো। মনে হতো, এই ভাবে একটা বছর কুস্তি করতে পারলেই আমরা এক একটী লৌহভীম হয়ে যাব, যা কোন ধৃতরাষ্ট্র চূর্ণ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, আমাদের সহরে একটা লোক ছিল যাকে আমরা ধৃতরাষ্ট্র বলে মনে করতাম। অন্ধ নয়, তবে চোখ দুটো ছোট ছোট। মিট্‌মিট্ করে আমাদের দিকে তাকাতো, যেন আমরাই ওর সব চেয়ে বড় শত্রু।

এঁর নাম দুবেজী, রাজাবাহাদুরের পোষা পালোয়ান। রাজা রহিস আর জমিদারের ছেলে ছাড়া আজেবাজে কোন মানুষের ছেলেকে দুবেজী কুস্তি শেখাতেন না। তিনি তো আর যে সে পালোয়ান ছিলেন না। তাঁর আখড়াটাও যা তা ছিল না। আমরা শুনেছিলাম, রাজাবাহাদুরের আখড়ার মাটী রোজ দু'সের ঘি দিয়ে মাখা হয়। দুবেজী স্বয়ং রোজ এক পোয়া গাওয়া ঘি চুমুক দিয়ে খান, মোষের দুধ এক বাল্‌তি, পেস্তা ও বাদাম এক সের ; তাছাড়া দিস্তা দিস্তা রুটি তো আছেই। তাঁর প্রকাণ্ড বুকটা সর্বদা ফুলে থাকতো, যেন একটা পালোয়ানী অহঙ্কারের ঢাক, ভুঁড়িটা যেন চর্বির জয়ঢাক, আর গাল দুটো ভাইটামিনের ডুগ্‌ডুগি। প্রতিদিন সকাল বেলা রাজাবাহাদুরের ঘি-খেকো আখড়ার সাম্‌নে দুবেজী লেঙ্গটি পরে জবুথবু হয়ে বসে থাকতেন, আর চারজন চেলা তাঁকে তেল মাখাতো। তখন তাকে মনে হতো, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরির শুঁড়কাটা পাথুরে হাতীটার মত— যেমন অতিকায়, তেমনই নিরেট আর তেমনই ভোঁতা!

কিন্তু আমরা যাই মনে করি না কেন, তাতে কি আসে যায়? পালোয়ান দুবেজীর খ্যাতিও ছিল প্রকাণ্ড। তাঁর নানারকম কেরামতী আর কীর্তির গল্প সহরময় সবাই জানতো। তিনি নাকি জীবনে একশো পালোয়ানকে হারিয়েছেন, কিন্তু নিজে আজ পর্যন্ত হারেন নি। তিনি নাকি একবার শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় পথে একটা ভালুককে টেলিগ্রাফের খুঁটি তুলে পিটিয়ে পিটিয়ে হালুয়া করে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এ হেন ভল্লুকসূদন দুবেজী প্রতি রবিবার দু'চারজন চেলা নিয়ে আমাদের আখ্‌ড়ায় উপস্থিত হতেন আর ঠাট্টা ক'রে হেসে হেসে একেবারে অস্থির হয়ে বলতেন—বাহ্‌বা বাহ্‌বা! যৈসা আখড়া তৈসা কুস্তি!

দুবেজী পালোয়ান আমাকে ডাকতেন—বেঙ বাবাজী। হরিশকে ডাকতেন—মক্ষি মহারাজ। আর কানুকে ডাকতেন—পতঙ্গ পালোয়ান। দুবেজী এই ভাবে এক একবার এসে আমাদের শুধু বেঙ মাছি আর পোকামাকড়ের সঙ্গে তুলনা ক'রে, ঠাট্টা ক'রে, তুচ্ছ ক'রে, চলে যেতেন।

হরিশ এক এক সময় সহ্য করতে না পেরে দুবেজী পালোয়ানকে মুখের উপর শুনিয়ে দিত—আপ তো গোদা হাতী হায়।

দুবেজী তখুনি রেগে কট্‌মট্‌ করে তাকাতেন—কেয়া বোলা রে মক্ষি? হাড্ডি তোড় ডালুঙ্গা, খবরদার!

রেগে উঠলেই আমাদের হাড্ডি গুঁড়ো ক'রে দিতে চাইতেন দুবেজী, আমরা সবাই চুপ ক'রে যেতাম। দুবেজী মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে পড়ে এই ভাবে অপমান ক'রে চলে যেতেন। আমাদের আখড়াটাকে কেন জানি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমরা শুধু ভাবতাম—দুবেজীর এই অহঙ্কার কবে চূর্ণ হবে?

কিছুদিন পরে, আজকের মতই শীতের একটি সকালবেলায় আমরা রাঁচী রোডের ওপর দাঁড়িয়ে একটা দৃশ্য দেখছিলাম। কলিয়ারীর এক সাহেবের মোটর গাড়ীটা হঠাৎ ড্রাইভারের ভুলে রাস্তার পাশে একটা ছোট খাদের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। ড্রাইভার বার বার ইঞ্জিন ষ্টার্ট ক'রে, সব রকম গীয়ার দিয়েও গাড়ীটাকে নড়াতে পারছিল না। সাহেব ড্রাইভার আর আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে গাড়ীটাকে ঠেলে ঠেলেও রাস্তার ওপর ওঠাতে পারলাম না।

এমন সময় একটী লোক উপস্থিত হলো। ধূলোয় ঢাকা খালি পা,

ছেঁড়া চাদর গায়ে জড়ানো। মুখটা শুক্‌নো। কিন্তু দেখতে লম্বা চওড়া। কোন কথা না ব'লে লোকটা এগিয়ে এল। মোটর গাড়ীর বাম্পারটা ধ'রে দু'টো হ্যাঁচকা টান দিয়েই গাড়ীটাকে একেবারে রাস্তার ওপর উঠিয়ে দিল। আমরা অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাহেব তাকে থ্যাঙ্কস্ জানিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন।

আমরা তাকে সশ্রদ্ধ ভাবে জিজ্ঞেসা করলাম—আপ কোন হ্যায় মহারাজ ?

লোকটী বললো—আমার নাম বাসুদেব, কুস্তি করি, রাঁচি থেকে হেঁটে হেঁটে আসছি।

এত বড় শক্তিধর বাসুদেব, কিন্তু তার মলিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ হচ্ছিল। এ দশা কেন ?

বাসুদেবের কাছেই তার দুঃখের ইতিহাস শুন্‌লাম। আজ তিন দিন বাসুদেব কিছু খায়নি। বেচারা বড় গরীব, গোরখপুরে তার বাপ মা ভাই বোন সবাই আছে। তারাও বড় কষ্টে আছে, বাসুদেব আজ দু'মাস হলো বাড়ীতে একটা পয়সা পাঠাতে পারেনি। অনেক চেষ্টা ক'রে একটা দারোয়ানী চাক্‌রিও পাচ্ছে না বাসুদেব।

আমরা বললাম—আপনি আমাদের এই সহরে খুঁজলে নিশ্চয় একটা কাজ পেয়ে যাবেন।

বাসুদেব বললো—কিন্তু যতদিন না পাই, ততদিন···?

আমরা বললাম—ততদিন আমরা চাঁদা ক'রে আপনাকে রোজ দু'সের ক'রে আটা দেব, আপনি আমাদের কুস্তি শেখাবেন।

বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! বাসুদেব পালোয়ানের শুক্‌নো মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

বাসুদেবকে ওস্তাদ পেয়ে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কুস্তি-চর্চা সুরু ক'রে দিলাম। বাসুদেবের কাছে আমরা কত নতুন নতুন প্যাঁচ আর

কাট্ শিখলাম। ঢাক কুলা সখি কালাজঙ্গ, বাহিরালি বগ্‌লি আর ধোবিয়া আছাড়, ঘিস্‌সা রদ্‌দা উখাড়—এক কুস্তিময় স্বর্গের অজস্র আশীর্ব্বাদে আমরা ধন্য হয়ে গেলাম, সার্থক হলো আমাদের আখড়া।

বাসুদেব পালোয়ানকে পেয়ে আমাদের গর্ব্বের অন্ত ছিল না। এই বার আমরা দুবেজীর অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌বো, নিশ্চয় কর্‌বো। একদিন সটান রাজাবাহাদুরের আখড়ায় গিয়ে আমরা কুস্তির চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হ'লাম—বাসুদেব ভাসাস দুবেজী।

দুবেজী নাক সিঁটকে বললেন—ঝিঙে ক্ষেতের আখ্‌ড়ার একটা বাজে পালোয়ানের সঙ্গে আমার মত পালোয়ান লড়্‌বে না। ভাগো হিঁয়াসে।

আমরা দলবেঁধে সারা সহর বাসুদেব ওস্তাদের গুণ গেয়ে আর দুবেজীকে দুয়ো দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম—বাসুদেব ওস্তাদ হুর্‌ রে! দূর্‌ রে দুবেজী দূর্‌ রে! সহরের চকের ওপর এসে আমরা আরও জোর গলায় ছড়া গেয়ে ঘটনাটা প্রচার করে দিলাম ঃ—

ডর্‌কে মারে ঘরমে ঘুসা
হাত্‌থি দুবেজী হো গিয়া মূসা

হাতীর মত দুবেজী ইঁদুর হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে আছে।

সত্যি সত্যি সারা সহরে একদিনের মধ্যেই দুবেজীর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জানলো, বাংলা স্কুল আখ্‌ড়ার বাসুদেব নামে এক নতুন ওস্তাদের চ্যালেঞ্জ নিতে পারেনি ভীতু দুবেজী, রাজাবাহাদুরের আখ্‌ড়ার জরদ্‌গব পালোয়ান!

বোধ হয় এই সহরময় ধিক্কারে অতিষ্ঠ হয়েই রাজাবাহাদুরের লোক এসে একদিন জানিয়ে গেল — চ্যালেঞ্জ নেওয়া হলো। আগামী ষষ্ঠীর দিনেই ধর্মশালার আঙিনায় বাসুদেবের সঙ্গে দুবেজী লড়বেন।

রাজাবাহাদুরের লোক চলে যেতেই বাসুদেব ওস্তাদ আমাদের

হাসতে হাসতে বললো — ঘাবড়াও নেহি খোকাবাবু, ঐ হাতীকে আমি কুমড়োর মত তুলে নিয়ে আছাড় দেব। দেখে নিও।

এই দৃশ্যটা দেখবার জন্যই আমরা দিন গুনছিলাম। কবে ষষ্ঠী আসবে? কবে দেখতে পাব, অহঙ্কারের হাতী দুবেজী ফাটা কুমড়োর মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে আখ্‌ড়ার ওপর, আর আমরা নেচে নেচে হুর্‌রে দিচ্ছি বাসুদেব ওস্তাদকে। ষষ্ঠীর দু'দিন আগে রাজাবাহাদুরের লোক এসে কুস্তির তারিখ পিছিয়ে দিতে বললো, কারণ দুবেজী অসুস্থ।

বাসুদেব বললো — আচ্ছা। আমরাও বললাম — আচ্ছা। ঠিক হলো চতুর্দশীর দিন কুস্তি হবে।

কিন্তু চতুর্দশীর দিনেও কুস্তি হলো না। আমরা আশ্চর্য হয়ে বাসুদেবকে জিজ্ঞেসা করলাম — কি ব্যাপার ওস্তাদ?

বাসুদেব ওস্তাদ বললেন — ও হ্যাঁ, আমাকে দুবেজী খবর পাঠিয়েছে, মাঘের দশ তারিখে কুস্তি হবে।

বার বার তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে আরও বেশী করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম, বাসুদেব ওস্তাদ আগের মত আর প্রতিদিন আমাদের কুস্তি শেখাতে আসছেন না। তিন চার দিন পর পর আসেন, কিছুক্ষণ থেকেই চলে যান। মুখে মুখেই আমাদের বাহ্‌বা দিয়ে চলে যান, আগের মত আখড়ায় নেমে আমাদের সঙ্গে আর কুস্তি করেন না।

আমরা আরও আশ্চর্য হলাম, বাসুদেব ওস্তাদ আর আমাদের কাছে দু'সের আটার জন্য পয়সা দাবী করেন না। বরং একদিন এসে উল্টে আমাদেরই সকলকে বরফি আর কিসমিস খাইয়ে গেলেন।

এরপর একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলাম, চকের ওপর পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বাসুদেব ওস্তাদ অনেকের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন, তাঁর মাথায় একটা রঙীন কাপড়ের পাগড়ী।

বাসুদেব ওস্তাদের উন্নতি হোক্ আমরা সবাই সেটা চাই। কিন্তু

এই হঠাৎ উন্নতির রহস্য আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এখনও কোথাও কোন চাক্‌রি পাননি বাসুদেব ওস্তাদ, তবুও বেশ সুখে আছেন মনে হচ্ছে। অথচ দুবেজীকে কুমড়োর মত তুলে আছাড় দেবার প্রতিজ্ঞা এখনো পূর্ণ হয়নি।

শেষ পর্যন্ত একটা দিন পাকাপাকি ভাবে স্থির হলো। ধর্মশালার আঙিনার মাটী খুঁড়ে নতুন আখড়া তৈরী হলো। ঢেঁড়া পিটিয়ে সহরে প্রচার করা হলো—আগামী রবিবার বাসুদেব বনাম দুবেজীর কুস্তি, বিকাল সাড়ে চারটা।

কুস্তির দিন আমাদের মনের অবস্থা বুঝতেই পারছো, পুতুল। দুবেজীর দর্প এত দিনে চূর্ণ হবে, ভাবতে ভাবতে আগের রাতটা আমাদের ঘুমই হলো না। সকাল বেলা গিয়ে আমরা ধর্মশালার আখড়ার মাটী থেকে সব কাঁকর বেছে দিয়ে এলাম।

ঠিক বিকেল সাড়ে চারটায় কুস্তি আরম্ভ হলো। ধর্মশালার আঙিনায় লোকে লোকারণ্য, রাজাবাহাদুর একটা জরীর পাগড়ী নিয়ে এসে বসেছেন। যিনি জয়ী হবেন তাঁকে এই উপহার দেওয়া হবে।

জয় মহাবীর ব'লে প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে তাল ঠুকে আখড়ায় প্রথমে নামলেন হস্তিকায় দুবেজী। অন্য দিক থেকে একটু বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে কি একটা কথা উচ্চারণ ক'রে আখ্‌ড়ায় নামলেন বাসুদেব ওস্তাদ। আমরাই জোরে হাঁক দিয়ে বাসুদেব ওস্তাদকে উৎসাহ জানালাম।

ধস্তাধস্তি, ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌টি, তাল ঠোকা, আর পাঁয়তাড়াই চল্‌লো অনেকক্ষণ। কুস্তিটা মোটেই জম্‌ছিল না। দুবেজী আর বাসুদেব, দু'জনেই কেমন যেন অনর্থক বার বার গায়ে মাটী মাখেন, আর বার বার তাল ঠোকেন। আমরাও দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

হঠাৎ একবার দেখলাম, দুবেজীর গর্দানটা অসাবধানে একেবারে

বাসুদেব ওস্তাদের বগলের কাছে চলে এসেছে। এমন সুন্দর সুযোগ! আমাদের আর তর্ সইছিল না। সবাই একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলাম—মারো ধোবিয়া বাসুদেব ওস্তাদ।

বাসুদেব ওস্তাদ একটা হুংকার দিয়ে দুবেজীর গর্দানটা বগলে চেপে সেই মারাত্মক ধোবিয়া আছাড়ের একটী ঝাঁকুনি দিলেন। কিন্তু হায়, হঠাৎ হাতটা যেন পিছ্‌লে, গেল, নিজের ঝাঁকির টাল সাম্‌লাতে না পেরে বাসুদেব ওস্তাদ যেন একটা গুলিবিদ্ধ বাঘের মত ছিট্‌কে গিয়ে আখ্‌ড়ার মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। জয় মহাবীর গর্জন ক'রে দুবেজী বাসুদেব ওস্তাদের বুকের ওপর বুক দিয়ে মাটীতে চেপে রাখলেন। বাসুদেব ওস্তাদ হেরে গেলেন।

জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! রাজাবাহাদুরের দল আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। বিজয়ী দুবেজী ধূলো-মাখা শরীর নিয়ে হাসিমুখে রাজাবাহাদুরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাজাবাহাদুর দুবেজীকে জরীর পাগড়ী পরিয়ে দিলেন। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন একটা অন্ধকার দেখছিলাম, সত্যিই লৌহভীম চূর্ণ হয়ে গেল। পরাজিত লৌহভীমের ব্যথার রক্ত যেন আমাদের চক্ষের অন্ধকারের ভেতর নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে, আমাদের চোখে জল আস্‌ছিল!

রাজাবাহাদুরের দল তখন দুবেজীকে শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাবার আয়োজন করছিল। আমরা দেখলাম, বাসুদেব ওস্তাদ ধর্মশালার আঙিনা থেকে একটু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়্‌ছেন আর মাঝে মাঝে আমাদের দিকে করুণ ভাবে তাকাচ্ছেন।

ধর্মশালার দারোয়ান হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের কাছে এসে চুপে চুপে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—দুঃখ করবেন না, খোকাবাবু। এটা মিলি কুস্তি হয়েছে। ব্যাটা বাসুদেব দুবেজীর কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুস খেয়ে ইচ্ছে ক'রে হেরেছে।

চম্‌কে উঠলাম আমরা। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমাদের বাসুদেব ওস্তাদ কি কখনো এরকম ছোট কাজ করতে পারে ?

তবু আমরা সবাই একসঙ্গে বাসুদেব ওস্তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—বাসুদেব ওস্তাদ, আপনি কি তুবেজীর কাছে টাকা নিয়ে··· ।

বাসুদেব ওস্তাদ চম্‌কে উঠলেন। তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিয়ে বললেন—কে বললে ? বিল্‌কুল মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা···।

বলতে বলতে বাসুদেব ওস্তাদ হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলেন। আমরা পেছু পেছু যেতে যেতে ডাকলাম—বাসুদেব ওস্তাদ !

বাসুদেব ওস্তাদ মুখ ফিরিয়ে বললেন—মিথ্যে কথা !

বাসুদেব ওস্তাদ রাস্তার ওপর দিয়ে খুব জোরে জোরে হেঁটে চললেন। আমরাও পেছু পেছু ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল্‌লাম—শুনুন বাসুদেব ওস্তাদ, শুনুন, শুনুন··· ।

চল্‌তে চল্‌তে সহরের বাইরে এসে পড়লেন বাসুদেব ওস্তাদ। আর একবার মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে মাঠের ওপর নেমে পড়্‌লেন। তারপর দৌড়তে আরম্ভ করলেন। আমরাও পেছু পেছু তাড়া ক'রে দৌড়ে চললাম। কানু বলে উঠলো—ধর ধর ধর।

বাসুদেব ওস্তাদ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করলেন ! একটা বাঘ সাংঘাতিক ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা ছ' সাতটি ছোট ছোট খরগোস তাকে তাড়া ক'রে চলেছি। তখন পশ্চিমে সূর্য্য ডুব্‌ছে, আর পূবে অনেক দূরে পাহাড়তলীর আবছায়ার মধ্যে একটা ঘণ্টা বাজ্‌ছে ঢং ঢং ঢং, করুণ সুরে।

বলতে পার পুতুল, কেন বাসুদেব ওস্তাদ এত ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন ?

১লা পৌষ, ১৩৫১।

মা
ব
মা
ব
ব
ব
পুতুলের
চিঠি

পয়লা মাঘ। কাঁকুলিয়া। স্নেহের পুতুল।

এবার তুমি একটা রূপকথা শুনতে চেয়েছ। কিন্তু রূপকথা কাকে বলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, পুতুল। দেব দানব যক্ষ রক্ষের গল্প? দেবী দানবী পরী অপ্সরার গল্প?

যেসব শুক আর সারী, সাতভাই চাঁপা আর পারুলদিদি, বেঙ্গমা আর বেঙ্গমী মজার মজার কথা বলে, তাদের আমি কোন দিন দেখতে পাইনি। তারা কোথায় থাকে আমি জানি না। হয়তো তারা কোথাও থাকে না, তারা কোথাও নেই। তাই বোধ হয় তাদের রূপ আর কথা দুইই এত সুন্দর।

কিন্তু ওরকম শুধু কল্পনার রূপকথা নয়। আমি যাদের স্বচক্ষে দেখেছি, তাদেরই রূপের কথা বলতে পারি। বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যে রূপকথা আমি বলতে পারবো না!

তবে শোন। আমি একদিন একটা দানবীকে দেখেছিলাম, আজকের মতই মাঘ মাসের এক কুয়াসা ভরা ভোর বেলায়। আর একবার একটি দেবী দেখেছিলাম, আজকের মতই হিমভরা মাঘের এক জোৎস্নামাখা রাত্রিতে। সে অনেকদিন আগের একটা ঘটনা, আমরা তখন হাজারিবাগের জেলা স্কুলে পড়ি।

সিংডিহি হাই স্কুলকে হকি ম্যাচে তিনটি গোল ঠুকে দিয়ে দয়াময় মেমোরিয়াল শীল্ড জয় ক'রে আমরা হাজারিবাগ ফিরছিলাম। সিংডিহি থেকে আমরা খুব ভোরেই রওনা হয়েছিলাম। আমাদের মোটর লরিও খুব আস্তে আস্তে হেড-লাইট জ্বালিয়ে চলছিল। কুয়াশার জন্যে সাম্‌নের পথ ঠাহর হচ্ছিল না। তার ওপর দু'পাশে ঘন শালের জঙ্গল, আর রাস্তাটাও এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো উঁচু নীচু আর নুড়িতে ভরা। আমরা বসেছিলাম লরির ভেতর দয়াময় শীল্ডকে বুকে জড়িয়ে। মাত্র দু' সের

পেতল দিয়ে তৈরী দয়াময় শীল্ড, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমাদের মনটা তখন বিজয় গর্ব্বে সোনা হয়েই ছিল।

একটা পাহাড়ী নদীর ভেজা বালির ওপর দিয়ে চলতে চলতে মোটর লরিটা হঠাৎ হেড্ লাইট নিবিয়ে দিয়ে থেমে গেল। কি ব্যাপার?

গাড়ী থেকে নেমে দেখি একটা পুলিশের লরি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুক হাতে নিয়ে কয়েকজন পুলিশও তৈরী হয়ে আছে। শালবনের মাথার ওপর দিয়ে সূর্যের আলো কুয়াশা ভেদ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটু দূরেই নদীর বালিয়াড়ীর ওপর একটা জায়গায় চিতার মত ক'রে কুল গাছের শুকনো শুকনো ডালপালা সাজানো রয়েছে। তারই সাম্‌নে একটা সিঁদূর মাখানো পাথর।

জঙ্গলে ভেতর একটা হৈহৈ চীৎকার আর ঢাকের শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলাম। শত শত লোক যেন ছুটে আসছে। পুলিশেরা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো, হাবিলদার গম্ভীর হয়ে বললেন—তৈয়ার রহো।

পুলিশেরা যেন কার প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে আছে। প্রথমে না বুঝলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ব্যাপারটা বুঝলাম। ঐ যে কুল গাছের ডালপালা চিতার মত সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে আজ গাঁয়ের লোকেরা এক ডাইনীকে পুড়িয়ে মারবে। এক ডাইনী নাকি অনেকদিন থেকেই লুকিয়ে ছিল ঐ গাঁয়ে। এই ডাইনীর জন্যেই নাকি এবছর গাঁয়ের ক্ষেতে সব মকাই অকালে শুকিয়ে গেছে। গাঁয়ের তিনটি ছেলে বসন্তে মারা গেছে। গাঁয়ের ওঝা অনেক তুক্‌তাক্ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত এই ডাইনীকে চিনে ফেলেছেন।

আসছে, আসছে, ডাইনী আসছে। গাঁয়ের লোক তাকে তাড়া করে নিয়ে আস্‌ছে। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্, ঢাকের শব্দ। হৈহৈ মার মার, চীৎকারের শব্দ।

জঙ্গলের ভেতর থেকে চীৎকার আর ঢাকের শব্দ যত কাছে এগিয়ে

আসছিল, ততই ভয়ে আর কৌতুহলে আমাদের বুক দুরদুর করছিল। কোন্ এক ভীষণা দানবীকে গাঁয়ের লোক নিয়ে আসছে ঐ কুলকাঠের আগুনের সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে! কে জানে কেমন তার রূপ!

চীৎকার আর ঢাকের শব্দটা জঙ্গল ভেদ ক'রে নদীর ওপর এসে পড়্লো। আমরা দেখলাম, শত শত লোক ঢাক বাজিয়ে আর নিমগাছের ডাল হাতে নিয়ে সত্যিই এক দানবীকে পিটিয়ে পিটিয়ে তাড়া ক'রে নিয়ে আসছে—মার্ মার্ মার্ ডাইনি মার্! মার্ মার্ মার্···।

পুলিশ দলকে দেখতে পেয়ে ডাইনীটা প্রাণপণে দৌড়ে আসতে লাগ্লো। নিম গাছের ডাল হাতে নিয়ে লোকগুলিও হিংস্র চীৎকার ক'রে আরও জোরে দৌড়ে আসতে লাগ্লো পেছু পেছু, ডাইনীকে ধরবার জন্য। কিন্তু ডাইনীকে তারা ধরতে পারলো না। নদীর ভেজা বালি আর নুড়ির উপর দিয়ে খেঁকশিয়ালীর মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ডাইনীটা একেবারে পুলিশের গাড়ীর সাম্নে আছাড় খেয়ে পড়্লো।

পুলিশ দলও তৈরী ছিল। নিমগাছের ডাল হাতে নিয়ে মারমুখী জনতা আর একটু এগিয়ে আসতেই পুলিশ বন্দুক তুলে হাঁক দিল—খবরদার। চীৎকার, ঢাকের বাজনা আর নিম ডালের আস্ফালন হঠাৎ থেমে গেল।

সকলেই কিছুক্ষণের মত চুপ চাপ। ডাইনীটা পুলিশ লরির সাম্নে ভেজা বালির ওপর মুখ থুব্ড়ে পড়ে আছে, পুলিশ নিঃশব্দে বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা দম বন্ধ করেই দাঁড়িয়ে দেখছি। গাঁয়ের জনতার ভেতর হঠাৎ একটা লোক ভয়ানক কর্কশ স্বরে চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠলো—মার! মার! মার! লোকটার চোখ দু'টো ভয়ানক লাল, মাথার চুল ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া আর গলায় একটা ভেলা ফলের মালা। এই লোকটা হলো গাঁয়ের ওঝা।

হাবিলদার লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওঝাকে একটা ধাক্কা মেরে

মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে ধরলেন। দ্রুম্ দ্রুম্ দ্রুম্—পুলিশেরা বন্দুক তুলে কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করলো। সঙ্গে সঙ্গে জনতা তেমনি মার্ মার্ চীৎকার করে পেছু ফিরে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। হাবিলদার বললেন—জলদি কর। ওরা তীর ধনুক আনবার জন্যে গাঁয়ের দিকে গেছে, এখুনই আবার ফিরে আসবে।

পুলিশেরা সঙ্গে সঙ্গে ওঝার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে আর কোমরে দড়ি বেঁধে লরিতে তুলে নিল। আম্‌রাও তাড়াতাড়ি আমাদের লরিতে উঠে দয়াময় শীল্ড বুকে জড়িয়ে বসলাম। কেমন ভয় ভয় করছিল, তার ওপর গাঁয়ের লোকগুলি ক্ষেপে উঠেছে, এখুনি ফিরে আসবে। এবার আর নিমগাছের ডাল নিয়ে নয়, বিষ মাখানো তীর আর ধনুক নিয়ে। এখানে আর একটু দেরি করলেই একটা ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে যাবে, নদীর ভেজা বালি মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠবে।

কিন্তু ডাইনীটা কি পড়েই রইল? আমাদের মোটর লরি ছাড়বার আগে একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লাম, একটা চৌকীদার ডাইনীকে হাত ধরে পুলিশের লরিতে তুলছে।

কী ভয়ংকর দানবী মূর্তি। আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। পাকা চুলের জটায় ভরা মাথা, কালো কুচকুচে মুখের চাম্‌ড়াটা শুকিয়ে কুঁচকে রয়েছে। দু'কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। একটা চোখ কাণা। পাকা চুলের জটার সঙ্গে ছেঁড়া ছেঁড়া নিমপাতা লেগে রয়েছে।

ডাইনী একবার হাই তুলে হাঁ ক'রে কাঁপতে লাগলো। মুখের ভেতর থেকে আরও অনেকখানি রক্ত গড়িয়ে পড়লো গল্ গল্ করে। ডাইনীটা বললো—জল!

আর কিছু দেখতে পেলাম না, আমাদের লরি রওনা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, পুলিশের লরিও আসছে।

শহরে ফিরে এলাম আম্‌রা। স্কুলে হাফডে ছুটি পেয়ে দয়াময় শীল্ড নিয়ে সারা বিকেল শোভাযাত্রা করে বেড়ালাম।

সন্ধ্যাবেলা নিতাই বিশু হরিদাস আর আমি খুব খুসী মনে বাড়ী ফিরছিলাম পুলিশ লাইনের মাঠের ওপর দিয়ে। আব্‌ছা অন্ধকার, কাছেই একটা বেলবাগান, আর তারই মধ্যে কাঁচের তৈরী ময়না ঘর, যেখানে সার্জন স্মিথ মানুষের লাস চিরে চিরে পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—জল! দু'কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, একটা ডাইনীর মুখ হাঁ করে বলছে—জল?

কী বিপদের কথা বল তো পুতুল! এত সময় থাক্‌তে ঠিক এই সন্ধ্যার সময়ে, আর এত জায়গা থাক্‌তে এই নির্জন বেলবাগানে ময়না ঘরের কাছে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেই ভয়ংকর বিশ্রী কথাটা—জল!

কে জানে সেই দানবী এখন কোথায়? হয়তো জল খেয়ে বেঁচে উঠেছে, হয়তো এতক্ষণে এই শহরেই কোথাও এসে লুকিয়ে রয়েছে। এই সময় যদি হঠাৎ সাম্‌নে এসে জল চায়, তাহলেই তো গেছি। আম্‌রা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ী চলে এলাম।

যাক্‌, মাত্র এই একটি দিনই আমরা ভয় পেয়েছিলাম, পুতুল। তার পর আর কিছু নয়। ক'দিন পরে সকালবেলা ঠিক এই বেলবাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমাদের খুব হাসি পাচ্ছিল।

বিশু বললো — এখন যদি সেই দানবীটা এসে জল খেতে চায়?

হরিদাস বললো — শুধু জল নয়, দানবীকে আচ্ছা করে বেলও খাইয়ে দেব।

মাগো! কে যেন আমাদের পেছন থেকে হঠাৎ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো। আমরা একটু চম্‌কে তাকিয়ে দেখি, এক কাঠকুড়ুনী বুড়ী কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

নিতাই বললো — বুড়ীটার পায়ে কাঁটা বিঁধেছে।

হরিদাস এগিয়ে গিয়ে বুড়ীর পা থেকে একটা মস্ত বড় কাঁটা তুলে ফেলে দিল। বুড়ী বললো — আঃ, বেঁচে থাক বাবা!

বড় দুঃখিনীর মত চেহারা এই বুড়ীর, মাথার পাকা চুলগুলি রুক্ষ জটার মত হয়ে গেছে, মুখটা শুকিয়ে কুঁচকে গেছে, একটা চোখ কাণা। দুটো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এই বুড়ো বয়সে কত কষ্টে কাঠ কুড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে।

বুড়ীর মুখের দিয়ে তাকিয়ে পর মুহূর্তে আমরা আরও চমকে উঠ্‌লাম। বিশু গর্জন করে বললো — এই, তুমি কে?···সত্যি করে বলো। কে তুমি?

বুড়ী এক চোখ দিয়ে আমাদের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বললো — আমি ভিকুর মা।

নিতাই ধমক দিয়ে বললো — মিথ্যে কথা, সিংডিহির জঙ্গলে তোমায় দেখেছি! তুমি সেই···।

হরিদাস বললো — তুমিই সেই ডাইনী?

বুড়ী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো —হ্যাঁ বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেল্‌লো বুড়ী। চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল গড়িয়ে পড়লো। আমরা স্বচক্ষে দেখলাম পুতুল, এ তো মোটেই দানবী নয়। পায়ে কাঁটা বিঁধলে কষ্ট পায়, অসহায় ভাবে কেঁদে ফেলে, চোখ দিয়ে আবার জলও গড়িয়ে পড়ে। এ যে একটী দুঃখিনী মানবী।

আমি জিজ্ঞেসা করলাম —তোমার ভিকু কই?

বুড়ী বললো — কোথাও নেই। অনেকদিন আগে, তোমার চেয়েও সে তখন দেখতে ছোট ছিল, একদিন তাকে বাঘে খেয়ে ফেললো। সেই দিন থেকে গাঁয়ের লোক আমাকে বলে ডাইনী।

বুড়ী আবার অনেকক্ষণ ধরে কাঁদ্‌লো। বুড়ীর কাহিনী শুনে একটু দুঃখিত হয়েই আমরা চলে এলাম।

বুড়ীও সত্যি সত্যি আর গাঁয়ে ফিরে যায়নি। এর পরেও বুড়ীকে

কয়েকবার দেখেছি। যখনই দেখতাম, তখনই ভাবতাম—যে ছিল জঙ্গলের এক দানবী, সে-ই হয়ে গেল এক কাঠকুড়ুনী মানবী! কী আশ্চর্য!

দয়াময় শীল্ড জয় করার জন্যে হেড মাষ্টার খুসী হয়ে আমাদের একদিন পুরষ্কার দিলেন, পাঁচটি টাকা। আমরাও খুসী হয়ে ঐ টাকা দিয়ে চাল ডাল ঘি আর রাব্‌ড়ি কিনে সবাই মিলে একদিন বিকেলে চলে গেলাম সীতাগড় পাহাড়ের কাছে একটা ডাক বাংলাতে, পিকনিক করবার জন্য। হরিদাস তার ছোটকাকার বন্দুকটাও লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে চলে এল। কে জানে আমাদের রাব্‌ড়ির লোভে আর ঘিয়ের গন্ধে যদি দু'একটা লোভী নেক্‌ড়ে-টেক্‌ড়ে একেবারে কাছে এসে হাই তুল্‌তে থাকে, তবে?

যেতে যেতে হলো সন্ধ্যা, উনুন ধরাতে ধরাতে হলো রাত্রি, খিচুড়ি রাঁধতে রাঁধতে হলো মাঝরাত্রি। আর খাওয়া দাওয়া সেরে ডাক বাংলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি শালবনের মাথার ওপর ভাঙা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

মাঘ মাসের কুয়াশা, অল্প অল্প হিমেল হাওয়া, বনফুলের গন্ধ, তার ওপর জ্যোৎস্না। সমস্ত শালবনটা মায়াপুরীর মত মনে হতে লাগ্‌লো। তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না পুতুল, নিঝুম রাতের শালবন জ্যোৎস্নার ছোঁয়ায় কী সুন্দর আলোছায়ার স্বপ্নের মত হয়ে ওঠে। ডাক বাংলার বারান্দায় আর আমাদের চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে মন চাইছিল না। একটা নিশির ডাক যেন আমাদের মনকে সেই তরুলতার মায়াপুরীর দিকে অনবরত টানছিল।

ডাক বাংলার জমাদারেরও বোধ হয় আমাদের হল্লায় ঘুম হচ্ছিল না। উঠে এসে বললো—আপনাদের সঙ্গে বন্দুক আছে?

হরিদাস বললো—হ্যাঁ।

জমাদার—তবে চলুন জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে বসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন ?

জমাদার—এই রকম চাঁদনী রাতে চিত্রা হরিণের দল শিশির ভেজা দুব্‌বো খেতে বের হয়। শিকার ক'রতে যদি সখ থাকে তবে চলুন।

শিকারের লোভে মোটেই নয়, আমরা দল বেঁধে জমাদারের সঙ্গে সেই নিঝুম রাতের মায়াবনে যেন মায়াহরিণ স্বচক্ষে দেখবার জন্যে জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম।

জঙ্গলের ভেতর বেশী গভীরে আমরা যাইনি। এক জায়গায় কতগুলো হরতকী গাছ গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়েছিল, সামনে ছোট একটা জলভরা দহ, তার কিনারায় যেন কচি কচি দুব্‌বো ঘাসের চাদর পাতা রয়েছে। আমরা সেখানে বসে শুধু মায়াহরিণের অপেক্ষায় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু কোথায় ? না মায়া হরিণ, না সজারু, না খরগোস, কিছুই যে আসে না। তবু তার জন্য একটুও দুঃখ হচ্ছিল না। আমরা অবাক্ হয়ে সেই বনময় আলোছায়ার অদ্ভুত খেলা দেখছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে জমাদার বললো—আর নয়, এবার ফেরা যাক্, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ?

জমাদার—ভয়ের কারণ আছে।

বিশু জিজ্ঞাসা করলো—এখানে বাঘ টাঘ আসে নাকি জমাদার ?

জমাদার—বাঘ এলে তো ভালই ছিল বাবু, ভাল শিকার করা হতো। তা নয়·····।

জমাদার যেন ভয় পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললো—শেষরাত্রির জঙ্গলে এমন একটি জীব ঘুরে বেড়ায় যাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করলেও মরে না। ধরতে গেলেও ধরা দেয় না।

হরিদাসও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো—এ আবার কেমন জীব জমাদার ?

জমাদার বললো—বনদেবী।

বনদেবী ? বনদেবী ? তাতে ভয় করবার কি আছে ? আমরা জমাদারের কথায় একটুও ভয় পায়নি, পুতুল। এই মায়াবনে এসে মায়াহরিণ দেখতে পেলাম না, কিন্তু যদি একবার বনদেবীকে দেখতে পাই তা'হলেই তো আমরা ধন্য হয়ে যাব।

কিন্তু সত্যিই কি বনদেবী আছেন ? জমাদারের কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমরা জঙ্গলের ভেতর একটা সরু পথের দিকে মাঝে মাঝে উৎসুক্ হয়ে দেখছিলাম, পথটা এঁকে বেঁকে আলোছায়ার ভেতর দিয়ে যেন কোন্ সুদূর প্রহেলিকার দেশে চলে গেছে।

বাপ্ রে বাপ ! ঐ আসছে ! জমাদার হঠাৎ একটা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে হরিদাসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো ! আমরাও চম্‌কে চারদিকে তাকালাম।

জমাদার আমাদের মিথ্যে ভয় দেখায়নি, পুতুল। জঙ্গলের সরুপথ ধরে, আলোছায়ার হাজার হাজার তোরণ ভেদ ক'রে, দূর থেকে কে যেন আসছে ! ধীরে ধীরে, ছন্দে ছন্দে, দুলে দুলে। তার শরীরটা যেন কুয়াশার মতই নরম, শাদা ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো বড় বড় দুটি বিনুনী দুল্‌ছে। মাথায় একটা মুকুটও আছে মনে হলো।

ধীরে ধীরে বনদেবী এগিয়ে আসছেন, আমরা আরও ভাল করে তাকিয়ে রইলাম। আরও কাছে এগিয়ে এলেন বনদেবী, এবার তাঁকে আরও স্পষ্ট করে দেখলাম। তাঁর মুখের ওপর পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়্‌ছে। ঝক্ ঝক্ করে উঠছে একটা হাসি হাসি মুখ।

আরও কাছে। আরও কাছে। বনদেবী হঠাৎ থেমে গেলেন। বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বনদেবী।

আমাদের আর একটুও ভয় করছিল না। এ বনদেবীকে এমনি চলে যেতে দেব না। তাকে আরও ভাল করে না দেখে, দুটো কথা না বলে কোনমতেই ছেড়ে দেব না। আমরাই এগিয়ে গিয়ে একেবারে বনদেবীর সামনে দাঁড়ালাম! বনদেবীর শরীরটা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো।

বনদেবীর মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে যা দেখলাম, তা আর বল্‌বার কথা নয়, পুতুল। পাকা চুলের জটায় ভরা মাথা, কুচকুচে কালো মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, একটা চোখ কানা, মাথার ওপর একটা হাড়ের বোঝা।

হরিদাস ধমক দিয়ে বললো — কে তুমি? সত্যি করে বল?

বনদেবী বললো—আমি ভিকুর মা।

হ্যাঁ, সত্যিই ভিকুর মা। দিনের বেলা জঙ্গল আফিসের গার্ডদের ভয়ে সে জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে পারে না, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবেলা ঢোকে। আর, মরা জন্তুর হাড় কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, রমজান মিঞার আড়তে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে।

জমাদার গর্জন করলো—চোর কাঁহাকা!

ভিকুর মা কেঁদে ফেললো—কি করবো বাবা! দুটো ভাতের জন্য বাবা! কোন উপায় নেই বাবা!

ভিকুর মা কাঁদতেই লাগ্‌লো, আমরাও ডাক বাংলায় ফিরে এলাম।

আমার গল্পও আজকের মত এইখানে শেষ করি, পুতুল। তুমি বলবে, এটা তো রূপকথা হলো না, এ যে ভিকুর মা'র কথা হয়ে গেল। যাই হোক্, তিন রকম রূপেই তো তাকে দেখেছিলাম। সেই কথাই এতক্ষণ বললাম। এখন তুমি বল, কোন্ রূপটা সত্যি? ভিকুর মা কি দানবী? না মানবী? না দেবী?

১লা মাঘ, ১৩৫১।